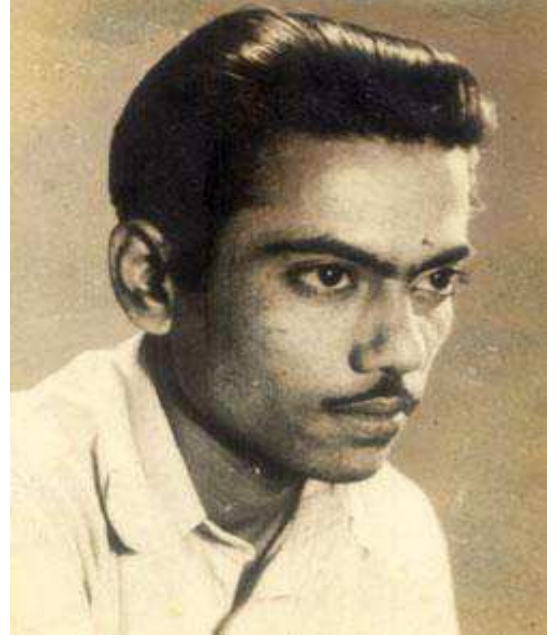


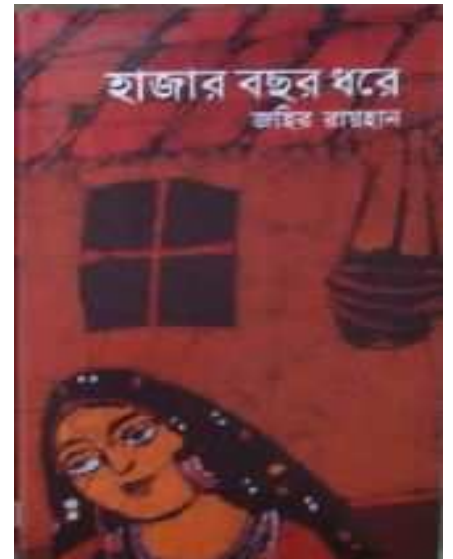


উপন্যাস



হাজার বছর ধরে

জহির রাঘবান





এসএসসি প্রোগ্রাম
বাংলা প্রথম পত্র : SSC-1651

মানবন্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন (কাঠামোবদ্ধ) :	৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :	৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
		<u>সর্বমোট = ১০০</u>

১. সৃজনশীল প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০ নম্বর।

গদ্য, কবিতা ও সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) অংশের প্রতিটিতে ৩টি করে প্রশ্ন থাকবে।

প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টিসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ :

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগদক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্কেল ঠিক রেখে গদ্য থেকে ১৫টি, কবিতা থেকে ১৫টি এবং সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) থেকে ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে।



হাজার বছর ধরে জহির রায়হান

ঔপন্যাসিক পরিচিতি

একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বোপরি চলচ্চিত্রকার হিসেবে জহির রায়হান আমাদের নিকট পরিচিত।



১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনি জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক। মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন রক্ষণশীল ও প্রভাবশালী তালুকদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার জননী সুফিয়া খাতুন সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। জহির রায়হান কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউটে ও পরে আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। দেশভাগের পর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আইএসসি পাস করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫২ সালে জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতা চলে যান এবং সেখান থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি ‘স্টপ জেনোসাইড’

পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। সেসময় তিনি আর্থিক সঙ্কটে পড়লেও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করেন।

অল্প বয়সেই জহির রায়হান সেসময়ের নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গোপন পার্টিতে তাঁর নাম রাখা হয় ‘রায়হান’। ১৯৫০ সালে তিনি ‘যুগের আলো’ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং পরে ‘খাপছাড়া’, ‘যান্ত্রিক’, ‘সিনেমা’ প্রভৃতি পত্রিকাতেও কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ‘প্রবাহ’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে ‘জাগো হুয়া সাবেরা’ ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। তিনি ‘যে নদী মরুপথে’ ও ‘এ দেশ তোমার আমার’ ছবিতে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র ‘কখনো আসেনি’ মুক্তি পায়। এরপরে তাঁর নির্মিত ছবি কাজল, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, জীবন থেকে নেয়া, আনোয়ারা, সঙ্গম, বাহানা মুক্তি পায়। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) ‘সূর্যগ্রহণ’ প্রকাশিত হয়। ‘হাজার বছর ধরে’ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ-উপন্যাসের জন্য তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। আবহমান বাংলার জীবন, জনপদ ও আচরণ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তিনি বাংলা একাডেমি ও স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে জহির রায়হানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাঁর বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়। জহির রায়হান খবর পান যে, তাঁর বড় ভাইকে ঢাকার মিরপুরে রাখা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি বড় ভাইকে উদ্ধারের জন্য মিরপুরে যান এবং আর ফিরে আসেননি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯), বরফ গলা নদী (১৯৬৯), আর কতদিন (১৯৭০), কয়েকটি মৃত্যু।

প্রবন্ধ : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৭১)।

এছাড়া তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি পড়া শেষে আপনি-

- উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উপন্যাসের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কাহিনি-সংক্ষেপ লিখতে পারবেন;
- টুনি ও মস্তসহ প্রধান চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উপন্যাস হিসেবে ‘হাজার বছর ধরে’র সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- উপন্যাসের সংজ্ঞা ও পরিচয় বলতে পারবেন;
- উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সাহিত্য জীবনের কথা বলে, সাহিত্য সমাজের কথা বলে। সাহিত্য আমাদের মুখোমুখি করে জীবন-সত্যের ও সমাজ-সত্যের; আমরা উপলব্ধি করি জীবনের তাৎপর্য এবং সামাজিক বাস্তবতা। সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করি এমন এক নির্মল আনন্দলোকে, যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের দ্বারা।

সাহিত্যের প্রধান শাখা পাঁচটি : কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। প্রকাশরীতির পার্থক্যের কারণে এক শ্রেণির সাহিত্য অন্য শ্রেণির সাহিত্য থেকে আলাদা। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যের গুরুত্বই পাওয়া গেছে কবিতা। এজন্য কবিতাকে বলা চলে সাহিত্য-শিল্পের আদি মাধ্যম। নাটকের বয়স কবিতার মতো অত নয়; কিন্তু নাটকও বেশ পুরনো। যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে খ্রিস্টে রচিত হয়েছিল অপূর্ব সব নাটক। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত নাটকের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে।

প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ছোটগল্প –সাহিত্যের এ-সকল মাধ্যম তুলনামূলকভাবে নবীন। যে ধরনের রচনাকে আমরা উপন্যাস বলে চিনি, তার উদ্ভবের বয়স তিন-চারশ বছরের বেশি নয়। আর ছোটগল্পের বয়স তো আরো কম। তবে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে উপন্যাসের স্থান সবার ওপরে। আগেই বলেছি, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের (Form) মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের মূল উপজীব্য মানব-জীবন ও মানব-সমাজ। মানব-জীবন ও মানব-সমাজ কখনো কবিতায়, কখনো নাটকে, কখনো উপন্যাসে, কখনো প্রবন্ধে, কখনো বা ছোটগল্পে ধরা পড়ে। সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই রয়েছে একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নীতি ও রীতি, যার কারণে এক প্রকার মাধ্যম অন্য মাধ্যম থেকে আলাদা। উপন্যাসেরও রয়েছে তেমন কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলে উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের পক্ষে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সহজ হবে।



উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ

শুধু কতকগুলো শব্দের সাহায্যে কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মকে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। কারণ তাতে ঐ বিশেষ শিল্পকর্মের সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। এ-কারণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সৃষ্টিশীল বিষয়ের কোনো সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করাও দুরূহ। উপন্যাসের সকলের কাছে সমানভাবে গৃহীত কোনো সংজ্ঞার্থ নেই। সাধারণভাবে বলা যায়— গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তবসম্মত কাহিনিকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে।

উপন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Novel. শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে ইতালীয় শব্দ novella থেকে; আর এর অর্থ হচ্ছে ‘tale, piece of news’। উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে J. A. Cuddon তাঁর ‘Dictionary of Literary Terms’-এ লিখেছেন ‘It is a form of story or prose-narrative containing characters, action and incidents and perhaps a plot’. অন্যভাবে বলা যায়, ‘Novel is a fictitious prose-narrative or tale presenting a picture of the man and women portrayed’.

‘উপন্যাস’ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় উপ+নি+অস্; অর্থাৎ ‘উপ’ পূর্বক, ‘নি’ পূর্বক ‘অস্’ ধাতুর সঙ্গে ‘অ’ প্রত্যয় যোগে ‘উপন্যাস’ শব্দটি গঠিত।

মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত রূপ। জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালবাসা-ঘৃণা –এ-সকল বিপরীতমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হাত ধরাধরি করে চলে। সুখের উল্টো পিঠেই যেন থাকে দুঃখ, আনন্দের পাশেই থাকে বেদনা। একজন ঔপন্যাসিক মানুষের সমগ্র জীবনকে যেহেতু তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করতে চান, ফলে তাঁকে অর্জন করতে হয় জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা। কিন্তু জীবন বড় জটিল এবং সূক্ষ্ম, আর তার চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও বিচিত্র মানুষের মন। সুতরাং ঔপন্যাসিককে মানুষের জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। কারণ তিনি মানব-মনের গহিনে ভ্রমণ করেন।

পদ্যভাষায়ও উপন্যাস লেখা চলে; তবে সাধারণভাবে গদ্যই উপন্যাসের মাধ্যম। সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তির দিক এই যে, মানবজীবনের বৈচিত্র্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে এ মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। মানুষের সংলাপ ও উচ্চারণের বৈচিত্র্য, ব্যক্তি-মানুষের ভিন্নতা, আচার-আচরণ ও রীতি-রেওয়াজের নানা রূপ উপন্যাসের শরীরে সহজেই আঁটানো যায়।

উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতি

উপন্যাসের প্রধান উপাদান ৫টি:

১. কাহিনি বা প্লট (Plot),
২. চরিত্র (Character),
৩. সংলাপ (Dialogue),
৪. ভাষা (Diction),
৫. ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন (Author’s philosophy or thought)।

একটি উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে তাতে একটি কাহিনি থাকতে হবে এবং সেই কাহিনি খুব ছোট হবে না। কাহিনিটি কতকগুলো চরিত্রকে অবলম্বন করে বিকশিত, পল্লবিত এবং পরিণামমুখী হয়ে উঠবে। চরিত্রগুলোর বিকাশের প্রয়োজনে লেখক সংলাপের সাহায্য গ্রহণ করেন, উপযোগী ভাষাভঙ্গি নির্বাচন করেন এবং উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনকে পাঠকের সামনে ক্রমশ উন্মোচন করেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, সকল শিল্পেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক সত্যকে প্রকাশ করা। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মানুষ। কিন্তু সে মানুষ আমাদের চারপাশের টুকরো টুকরো মানুষ নয়; অখণ্ড, অবিভাজিত মানুষ। একজন মানুষ তাঁর জীবনের নানা কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন, তিনি হয়তো বেঁচেও থাকেন দীর্ঘদিন। ঔপন্যাসিক যখন তার জীবনের নির্বাচিত অংশ উপন্যাসে অঙ্কন করেন, তখন কিন্তু তাকে খণ্ডিত করা হয়



না। আমরা প্রতিদিন যে সকল কর্মসম্পাদন করি, তার সবকিছুই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মূল্যবান নয়, এমন কি প্রতিদিনের জন্যও মূল্যবান নয়। সে কারণে ঔপন্যাসিক জীবনের সেই অংশগুলোকেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নির্বাচন করেন, যা চরিত্রের সমগ্র সত্তাকে প্রতিবিম্বিত করে। ঘটনা নির্বাচনের কৃতিত্বের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে উপন্যাসের সাফল্য বা ব্যর্থতা।

একই সঙ্গে ঔপন্যাসিককে স্থান-কালের নির্বাচনের ব্যাপারেও হতে হয় সতর্ক। কোন্ সময়ের বা কোন্ সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা বিকশিত হচ্ছে তাকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে উপন্যাসের চরিত্র এবং স্থান-কালের ব্যবহারে যে ঔপন্যাসিক যত সতর্ক তাঁর উপন্যাস তত সার্থক।

জহির রায়হান রচিত ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে আমরা দেখবো, এ-উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র মস্ত আর টুনি। এখানে ঔপন্যাসিক তাদের জীবনের সেই সময় এবং কর্মকে শব্দে রূপ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐ দুটি মানব-মানবীর চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের জীবনের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট স্থান-কালের নির্বাচিত ঘটনা অবলম্বন করেই পাঠককে একটি সামগ্রিক (Total) ধারণা প্রদানে সমর্থ হয়েছে। আর ঐ প্রধান চরিত্র দুটোকে বিকশিত এবং বিশ্বাস্য করে উপস্থাপনের জন্য লেখক একটি সামাজিক পরিমণ্ডল এবং সামাজিক সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

আগেই বলেছি, সৃষ্টিশীল বিষয়ের ব্যাপারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো মত নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ। উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগের বেলাতে সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের মধ্যে সে কারণেই রয়েছে মতভেদ। অধিকাংশের মতে ঘটনা-প্রধান উপন্যাসকে প্রধানত চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। সেগুলো হল :

১. সামাজিক উপন্যাস
২. ঐতিহাসিক উপন্যাস
৩. পৌরাণিক উপন্যাস
৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

১. সামাজিক উপন্যাস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই তাঁর অবস্থান এবং সমাজকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যে উপন্যাসে সমাজ-জীবনের বাস্তব ঘটনা বা কাহিনিই প্রধান অবলম্বন, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়াবলি যেমন পরিবার, রাজনীতি, দেশ, ধর্ম, দর্শন স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নেয় সামাজিক উপন্যাসে। সমাজের সম্ভাবনা, তার সবলতা-দুর্বলতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ঔপন্যাসিক কখনো সহমর্মিতায় কখনো বা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামাজিক উপন্যাসে উপস্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ ও ‘বিষবৃক্ষ’; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যোগাযোগ’ ও ‘চোখের বালি’; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পল্লীসমাজ’, ‘দেনা পাওনা’ ও ‘গৃহদাহ’; তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’, ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘গণদেবতা’, ‘ধাত্রীদেবতা’ ও ‘পঞ্চাঙ্গাম’; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতি’, ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, ‘পদ্মানদীর মাঝি’; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ এবং শওকত ওসমানের ‘জননী’ প্রভৃতিকে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইতিহাসের বিশাল জগৎ থেকে কোনো চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত না করে ঔপন্যাসিক নতুন করে তার মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কারের বাসনা থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তবে সবসময় লেখকের পক্ষে ইতিহাসের উপাদানকে অবিকলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক তাতে কল্পনার রঙ মিশিয়ে দেন। এতে ইতিহাস বিকৃত হয় না, বরং নতুন তাৎপর্য লাভ করে; পাঠকের সামনে প্রচলিত ইতিহাসকে নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের



‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘রাজসিংহ’ ও ‘চন্দ্রশেখর’; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজর্ষি’, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

৩. পৌরাণিক উপন্যাস

পুরাণ বা মিথ অবলম্বনে যে-সকল উপন্যাস রচিত হয়, তাকে বলা যায় পৌরাণিক উপন্যাস। আদিকালের মানব-সমাজের লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের সংস্কারকে আমরা পুরাণ বলে জানি। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ইলিয়াড, অডিসিতে সেকালের মানুষের যে কর্মকাণ্ড বা আচার-আচরণের পরিচয় পাই তাকে আমরা পৌরাণিক জগতের বিষয় বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিককালের অনেক লেখকই পুরাণের জগতের কাহিনি অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনির প্রেরণায় রচিত জেমস জয়েসের ‘ইউলিসিস’ উপন্যাসটি সমগ্র পৃথিবীর উপন্যাস-সম্পর্কিত ধারণাকে এক সময় প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় সত্যেন সেন ‘অভিশপ্ত নগরী’ ও ‘পাপের সন্তান’ নামে দুটি অসাধারণ পৌরাণিক উপন্যাস রচনা করেছেন। সেলিনা হোসেনের ‘কালকেতু ও ফুল্লরা’কেও এক অর্থে পৌরাণিক উপন্যাস বলা যায়।

৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের হাসি-কান্না এমনকি তাদের আচরণ ও উচ্চারণ অবিকৃত ভঙ্গিতে যে-সকল উপন্যাসে স্থান পায় সেগুলোকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। একই দেশের মধ্যে হলেও, প্রতিটি অঞ্চলেরই থাকে কিছু স্বাতন্ত্র্য। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যেও বেশ লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। একজন ঔপন্যাসিক যখন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের এই সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলে কোনো উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন, তখনই আঞ্চলিক উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’; সতীনাথ ভাদুড়ির ‘টোড়াই চরিত মানস’; দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’; আলাউদ্দীন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’; অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

এছাড়াও গঠনকৌশল, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পচেতনার পার্থক্যের দিক থেকে উপন্যাসকে আরও অনেকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ভ্রমণ-উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, গোয়েন্দা উপন্যাস, প্রতীকী উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস প্রভৃতি।

ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। দানিয়েল ডিফো তাঁর ‘রবিন্সন ক্রুসো’ (১৭১৯) রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু করে তুললেন এবং বিশ্বসাহিত্যের কাছে পৌঁছে দিলেন এই বার্তা যে, গোষ্ঠী-জীবনের যে সাহিত্য সমগ্র মধ্যযুগে চর্চার প্রধান বিষয় ছিল, তার কাল ফুরিয়েছে। এই নতুন ধরনের সাহিত্যমাধ্যম সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ডিকেন্স ও জর্জ এলিয়ট, বালজাক ও জোলা, দস্তয়ভস্কি ও টলস্টয় তাঁদের অসাধারণ রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের কালে উপন্যাসকে মহত্তম শিল্পমাধ্যমে পরিণত করেছে।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব

এ-কথা প্রায় আমরা সবাই মনে নিয়েছি যে, বাংলা উপন্যাস ইংরেজি সাহিত্যের সরাসরি প্রভাবে উদ্ভূত এবং সমৃদ্ধ। তবে অনেক প্রাচীন সাহিত্যেই উপন্যাসের নানা লক্ষণ ও ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায় উপন্যাসের বেশ কিছু পূর্ব-লক্ষণ। বাংলা ভাষায় রচিত লৌকিক ধর্ম-সাহিত্য, যেমন ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ও ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে দেবী-কীর্তনের পাশাপাশি সমকালীন মানুষ, তাদের জীবনের নানা জটিলতা ও সম্ভাবনা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়াও চৈতন্য-বিষয়ক সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, বাংলা রোমান্সমূলক কাব্যগুলোতে পাওয়া যায় উপন্যাসের নানাবিধ লক্ষণ ও চিহ্ন। পুরনো সাহিত্যে উপন্যাসের যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তা একটি কথা প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষায় উপন্যাস একেবারে ‘নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মতো’ হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসের ছদ্মবেশী উপস্থিতি এবং সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল, ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ তার রূপ, রীতি ও প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করেছে।



উপন্যাস সৃষ্টির জন্য গদ্যের যে সাবলীলতা প্রয়োজন তার আয়োজন চলে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে। তখন বাংলা অঞ্চলে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর গদ্যই হচ্ছে সংবাদপত্রের বাহন। ১৮১৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পর থেকে সামাজিক-ধর্মীয় বা সমাজসংস্কারমূলক সকল কর্মকাণ্ডের প্রচারক্ষেত্র হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায় তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতার তৎকালীন সমাজ-জীবনে যে বিক্ষোভ ও তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতই ধরা পড়ল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। শুধু তর্ক-বিতর্কই নয়, দেশের বাস্তব জীবনের ছবিও ক্রমে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উঠে আসতে লাগল। এজন্য বলা হয়, ‘উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হয়েছে’। সংবাদপত্রের এই সামাজিক প্রভাব বাংলা গদ্যের চেহারাকে একদিকে যেমন বদলে দিল, পাশাপাশি দেশ জুড়ে তৈরি করলো সংবাদভুক পাঠক-শ্রেণি। নব-উদ্ভূত এই পাঠক-শ্রেণির চাহিদাও বাংলা ভাষায় উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮)-কে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতাকেন্দ্রিক সামাজিক জীবনের বাস্তব বর্ণনায়, চরিত্র-চিত্রণে ও মননশীলতায় ‘আলালের ঘরের দুলাল’ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে সজীব ও প্রাণবন্ত।

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাত্মক গণ্য। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে ও ভাষার ব্যবহারে এ উপন্যাসে তিনি যে রূপ ও রীতি নির্ধারণ করেন, বহুদিন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস তার বাইরে যেতে পারেনি। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ছাড়াও ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬), ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩), ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮), ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫), ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের নানামুখী উপন্যাসপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বঙ্কিমের সমকালে উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচিত ‘বিষাদসিন্ধু’ (১৮৮৫-৯১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাধিক। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাস ও সমাজচেতনার যে ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে অবিকল সে ছবি আঁকলেন না। প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাস অবলম্বনে দু’-একটি উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই সমাজ, মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি-নির্ভর। ‘চোখের বালি’ (১৯০৩), ‘গোরা’ (১৯০৯), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬), ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯), ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯), ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ উপন্যাস। প্রকৃতপক্ষে এ সকল উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাস উপনীত হয় আন্তর্জাতিক মানে।

বাংলা উপন্যাসকে সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ও সমাদৃত করে তোলার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী এই ঔপন্যাসিক বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা অসামান্য ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘকালের অবহেলিত নারী-সমাজের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও দরদ। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষার নিপুণ তুলিতে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। তা ছাড়া হিন্দু সমাজের নানা আচরণ এবং সংস্কারের চিত্রও শরৎচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রচিত ‘চন্দ্রনাথ’ (১৯১৬), ‘পল্লীসমাজ’ (১৯১৬), ‘শ্রীকান্ত’ (চার খণ্ড, ১৯১৭-৩৩), ‘চরিত্রহীন’ (১৯১৭), ‘দেবদাস’ (১৯১৭), ‘গৃহদাহ’ (১৯২০), ‘দেনাপাওনা’ (১৯২৩), ‘পথের দাবী’ (১৯২৬) প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে নানারূপ বৈচিত্র্য। জীবন-চিত্রণের ক্ষেত্রে, উপন্যাসের গঠন-কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে, জীবনোপলব্ধিতে ও তার প্রকাশে এ-সময়ের উপন্যাস বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। অনেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ থেকে ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়েছে। যাদের রচনার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে এই সিদ্ধি তাঁদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রবোধকুমার



সান্যাল (১৯০৫-৮৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০), কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-৭৯), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৬), বনফুল (১৮৯৬-১৯৭৯), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার পরও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের তুলনায় বাংলাদেশের উপন্যাস চরিত্র ও চিত্রে স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতা, কৃষিনির্ভর জীবন, জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বোধ এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের একটি অনিবার্য পার্থক্য তৈরি করেছে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ যে স্বতন্ত্র জীবনধারা অর্জন করেছে মূলত তার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাস। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও বাস্তব জীবন উপন্যাসে যতটা প্রতিফলিত হয় অন্য কোনো সাহিত্য-মাধ্যমে ততটা হয় না। সে কারণেই বিভাগপূর্ব ও বিভাগান্তর কালের কয়েক দশকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলাদেশের উপন্যাসে ধরা পড়েছে তার নিখুঁত ছবি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক প্রভাবশালী ঘটনা। ভাষার প্রশ্নে এবং শহিদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হল তা বাঙালি জীবনকে নিয়ে গেছে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের দিকে। সে পরিবর্তনের জোয়ার তীব্রতর হয়েছে আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনেও। এর পরিণাম হিসেবে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। এ সকল ঘটনা বাংলাদেশের সমাজ ও জনজীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বাঙালির চেতনায় যে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের উপন্যাসে। তার একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লিজীবন অপরদিকে আধুনিক দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন; একদিকে বাংলাদেশের ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা, অপরদিকে আধুনিক মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, অপরদিকে রোমান্টিক কল্পনার বিলাস; একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্থিরতা, অপরদিকে হৃদয়ের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ –সবই বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানে উপন্যাস কোনো পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতায় রচিত হয়নি। ফলে নানা বিষয়ে নানা ধরনের উপন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। নানা বিষয় ও ভঙ্গিতে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসগুলোকে পরিচিতির সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১. গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, আবু ইসহাকের ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’, সরদার জয়েনউদ্দিনের ‘আদিগন্ত’, জহির রায়হানের ‘হাজার বছর ধরে’, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর ‘চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান’, কাজী আফসার উদ্দিনের ‘চর ভাঙা চর’, শওকত ওসমানের ‘জননী’, আবুল মনসুর আহমদের ‘আবেহায়াত’ এ ধারার রচনা।

২. নগরজীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

আবুল ফজলের ‘জীবন পথের যাত্রী’, রশিদ করিমের ‘উত্তম পুরুষ’ ও ‘প্রসন্ন পাষণ’, আবু রুশদের ‘সামনে নতুন দিন’, ‘ডোবা হল দীঘি’ ও ‘নোঙর’, দিলারা হাশেমের ‘ঘর মন জানালা’, আমজাদ হোসেনের ‘অসামাজিক কাহিনী’, নীলিমা ইব্রাহিমের ‘বিশ শতকের মেয়ে’, আহসান হাবীবের ‘অরণ্য নীলিমা’, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর ‘নাম না জানা ভোর’ এ ধারার উদাহরণ।

৩. নগর ও গ্রামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘ক্ষুধা ও আশা’, শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংশপ্তক’, সরদার জয়েনউদ্দিনের ‘অনেক সূর্যের আশা’, আবুল মনসুর আহমদের ‘জীবনক্ষুধা’, আবুল ফজলের ‘রাঙা প্রভাত’, আনোয়ার পাশার ‘নীড় সন্ধানী’ ইত্যাদি।

৪. আঞ্চলিক জীবনচিত্র প্রধান উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’, তাসাদুক হোসেনের ‘মহুয়ার দেশে’, শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’, শামসুদ্দিন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’ ও ‘কাঞ্চনমালা’, সরদার জয়েনউদ্দিনের ‘পান্নামতি’ ইত্যাদি।



৫. মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ ও ‘শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন’, রাজিয়া খানের ‘বটতলার উপন্যাস’ ও ‘অনুকল্প’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘দেয়ালের দেশ’, ‘এক মহিলার ছবি’, ‘অনুপম দিন’ ও ‘সীমানা ছাড়িয়ে’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘চাঁদের অমাবস্যা’, শওকত আলীর ‘পিঙ্গল আকাশ’ ইত্যাদি।

৬. ঐতিহাসিক চেতনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস

শামসুদ্দিন আবুল কালামের ‘আলম নগরের উপকথা’, সরদার জয়েনউদ্দিনের ‘নীল রঙ’, আবু জাফর শামসুদ্দীনের ‘ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান’, ‘পদ্মা মেঘনা যমুনা’, সত্যেন সেনের ‘অভিশপ্ত নগরী’ ইত্যাদি উপন্যাস ঐতিহাসিক ধারার রচনা।

হাজার বছর ধরে : উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, চিত্রপরিচালক এবং চিত্রপ্রযোজক হিসেবে সমকালে এবং আজও জহির রায়হানের সুখ্যাতি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র থাকাকালেই তিনি লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুরুতে কিছুদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত তিনি আমৃত্যু চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জহির রায়হান যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা সুলভ নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও মানবতার যে অবমাননার কথা তিনি সেলুলয়েডে বন্দী করে রেখেছেন, তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক নির্ভরযোগ্য ও অসামান্য দলিল। সাহিত্য রচনার শুরুতে তিনি গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হলেও উপন্যাস রচনাতেই তাঁর সাফল্য সর্বাধিক। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই জহির রায়হানের অধিকাংশ উপন্যাসে চলচ্চিত্রের কাহিনি-নির্মাণ ও সংলাপ-পদ্ধতি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এর ফলে তাঁর উপন্যাসগুলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন শিল্পভঙ্গিতে নির্মিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে লক্ষ করা যায় সমাজ, রাজনীতি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো লেখক প্রদান করেননি, কিন্তু পাঠকের মনকে নতুন চিন্তার সূত্র প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন।

‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এর আগে তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘সূর্যগ্রহণ’ (১৯৬৫) এবং একটি উপন্যাস ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ (১৯৬০) প্রকাশিত হয়েছিল। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটিতে লেখক বস্তুত হাজার বছরের নিস্তরঙ্গ কিন্তু প্রবহমান গ্রাম-বাংলাকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেন। উপন্যাসটির নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার চরণ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি)। টুনি, মস্ত, আশিয়া, বুড়ো মকবুল –এরা কেবল এক-একটি চরিত্রই নয়, এক বিশাল ব্যাপ্ত সময়ের প্রতিনিধি।

‘হাজার বছর ধরে’ জহির রায়হানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতার দীর্ঘ পরিসরকে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনার পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে গ্রামীণ জীবন ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের পটভূমি, সেখানে প্রবল কোনো চলমানতা নেই। প্রথাবদ্ধ, নিস্তরঙ্গ, উন্নয়নবিহীন গ্রামীণ বাস্তবতা এবং গ্রামের সহজ সরল প্রায় নিরক্ষর মানুষের জীবনসত্য উঠে এসেছে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে। কিন্তু লেখক পশ্চাত্তম সমাজ-ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির মধ্যেও খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন চিরকালের মানবিক আবেগ ও তার প্রাণময় স্পন্দন। এ উপন্যাসে লেখক কোনো শক্তিশালী চরিত্র সৃষ্টি কিংবা চরিত্রের উত্থান-পতন না দেখিয়ে সন্ধান করেছেন জীবনের অখণ্ডরূপ। আর সে অখণ্ড রূপের এক একটি উপকরণ হিসেবে বুড়ো মকবুল, সুরত আলী, ছমির শেখ, গনু মোল্লা, রশীদ, আবদুল, মস্ত, টুনি, আশিয়া, হালিমা, হীরন, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা প্রভৃতি চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের ঐ সকল মানুষের জীবনে ঘটনার তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। অতি সাধারণ তাদের চাওয়া-পাওয়া। তাদের জীবনের দিগন্ত প্রসারিত নয়, তাদের জীবনের চিরসঙ্গী দারিদ্র্য, ঈর্ষা, কলহ আর অবুঝ ভালোবাসা। জহির রায়হান জীবনের চিরন্তনতার বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। সামন্ত সমাজের নানা দ্রুতি-বিচ্যুতি, নারীর প্রতি পুরুষের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কনে জহির রায়হান সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। বুড়ো মকবুল যখন জোড়া বউকে টেকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে, তখন পাশের বাড়ির আশিয়ার যে গান ভেসে আসে, তার মধ্য দিয়েই যেন সমাজের মুক্তিহীন কারাগারে বন্দি নারীজীবনের শূন্যতা, অচরিতার্থতা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় : ‘স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুদের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।’



উপন্যাসে শোষণমূলক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে ভারবাহী পশুতে রূপান্তরিত করেছে। এ যেন সুস্থ জীবনের বিপরীতে মানবতার এক করুণ পরাজয়।

গ্রামীণ জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি অঙ্কনের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনের আবহমান ও চিরকালীন রূপটিও সন্ধান করেছেন। নিস্তরঙ্গ, ঘটনাবিহীন একঘেঁয়ে জীবনের মধ্যে মন্তু, টুনি, আশিয়া বা বুড়ো মকবুল চরিত্রের গতিশীলতা উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

জহির রায়হানের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : ‘আরেক ফাল্গুন’ (১৯৬৮), ‘বরফ গলা নদী’ (১৯৬৯) ও ‘আর কতদিন’ (১৯৭০) ইত্যাদি।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদিরূপ কোনটি?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. কবিতা | খ. উপন্যাস |
| গ. মহাকাব্য | ঘ. গীতিকাব্য |

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে সমাজের সংস্কার ফুটে উঠেছে—

- | | |
|----------|-----------|
| ক. বৌদ্ধ | খ. হিন্দু |
| গ. জৈন | ঘ. বাহাই |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মানব জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহার। এ জীবনে আছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালবাসা-ঘৃণা। মানব জীবনের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো বর্ণনাত্মক রীতিতে গদ্য ভাষায় সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখায় উপস্থাপিত হয়।

৩. উদ্দীপকের বক্তব্যটি সাহিত্যের কোন শাখাকে নির্দেশ করে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. উপন্যাস | খ. নাটক |
| গ. মহাকাব্য | ঘ. গীতিকবিতা |

৪. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত অংশটির মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ক. জীবন রূপায়ণে | খ. জীবনের অভিজ্ঞতায় |
| গ. জীবনে প্রতিষ্ঠায় | ঘ. জীবনে অধঃপতনে |



হাজার বছর ধরে জহির রায়হান

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- উপন্যাসটির পটভূমি বলতে পারবেন;
- প্রধান দুটো চরিত্রের প্রাথমিক পরিচয় বলতে পারবেন;
- সাধারণ মানুষের জীবনে লোক-বিশ্বাসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গ্রামের নারী-সমাজের কর্মক্লিষ্ট জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা ঐক্যবৈক্যে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধান খেতের মাঝখান দিয়ে।
মোঘলাই সড়ক।

লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন
যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।

দুপাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে। ওরা এই
সড়কের চিরন্তন গ্রহরী।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।

মাঝে মাঝে ধান খেত সরে গেছে দূরে। দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথই পানি। শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে
মাথা দুলিয়ে নাচে অগণিত শাপলার ফুল।

ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। এক বুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-ছল্লোড়
আর মারামারি করে, গালাগাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।

কিন্তু এমনো অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।

মস্ত আর টুনি ওদেরই দলে।

ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশের শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে
ওরা। রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মস্ত নেমে যায় পানিতে।

তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।

পরির দীঘির পাড়ে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।

মস্ত বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো।

টুনি বলে, ইস্, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।

নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায়?

মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

বলে আবার হাসে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরির দীঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এ দীঘি এককালে এখানে ছিলো না।



আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে মুখে বলে দেয় এ দীঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।

সে অনেক বছর আগে।

তখন সড়ক ছিলো না। কিছুই ছিলো না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর। বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে পরিরা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। ওরা নাচতো, গাইতো, খেলতো।

লাল পরি, নীল পরি আর সবুজ পরি। পরিদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব। একদিন হঠাৎ পরিদের খেয়াল হল, একটা দীঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে পানি ছিটিয়ে, ইচ্ছেমতো হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।

আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এলো ওরা।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।

রূপোলি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরেছিলো এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো পরিদের হাসির শব্দ।

কথায় গানে আর কাজে।

রাত ভোর হবার আগে দীঘি কাটা হয়ে গেলো।

পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেলো দীঘি।

সেই দীঘি।

তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।

গভীর রাতে ধপাস ধপাস টেকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।

জোড়া বউকে টেকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়া মকবুল। পিদিমের শিখাটা টেকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না, হুঁ। এমনভাবে গর্জে ওঠে মকবুল, যেন খেতে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হট হট। হুঁ, আরো জোরে। আরো জোরে। ধমক খেয়ে টেকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আশ্রিয়ার গান শোনা যায়। ‘স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে’।

টেকিতে চড়লেই গান গাওয়ার সখ চাপে আশ্রিয়ার। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট-হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। চেহারা মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। টেকিতে চড়লে, টেকিকে আর সুখ দেয় না ও। এত দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় টেকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দর দর ঘাম নামে ওর। একটা চাটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আশ্রিয়া।

টেকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বারবার আশ্রিয়ার কথা মনে পড়ছিলো বুড়া মকবুলের। দাঁত মুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারল ও শুনছনি, আশ্রিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না, বলে বার কয়েক মাটিতে থুতু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিলো সে।

দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো ফকিরের মা। সেখান থেকে বললো, আহা মকবুল! বউগুলোর বুঝি এই রাতেরবেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাঁটাইছস, এহন এই দুপুর রাইতেও—, বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলো ও।

এ বাড়িতে মোট আট ঘর লোকের বাস।

সামনে নুয়ে পড়া ছোট ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ান। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে। আম কাঁঠাল পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে



ছোট বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দুএকটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছোট পুকুর। পুকুরে সিঙ্গ কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি উঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগে দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাটা কিছু ভালো।

মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।

বড় বউ আমেনা। কালো মোটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। খুব ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাধলে তল্লিতল্লা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।

মেজ ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরের তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছমাস বাপের বাড়িতে কাঁটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানে না। কেউ পনেরো বললেও সায় দেয়। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।

সবার ছোট টুনি। গায়ের রং কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তের-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সব কিছু ভুলে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

বুড়ো মকবুলের পরিবারে আরো একজন আছে।

নাম তার হীরন। ও তার বড়মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। দুএক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে। বড়, মেজ আর ছোট এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে, কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পৈঁয়াজ, লঙ্কা আর পান-সুপুরি কেনে মকবুল।

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোট জমিটা তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর শিমের গাছ লাগায়। দুবেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিষাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিন জনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।

মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।

তার পাশেরটা আবুলের।

তার পাশে থাকে রশিদ।

পাশাপাশি তিনটে ঘর।

সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মস্ত। একা মানুষ। বাবা মা ভাইবোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে, দশ বছর বয়সে। লোকে বলে, মস্ত নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।

টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।

আহা অমনটি আর হয় না।

ওপাশে আর কোনো ঘর নেই।

পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।

তার পাশে থাকে সুরত আলী।

তার পাশে গনু মোল্লা।

গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না। পাঁচেও না। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন ওঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াটা হাতে থাকে তার। আপন মনে তসবির পড়ে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব : ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৬ সালে। সম্রাট বাবর ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের পর আকবর ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই গোলযোগের মধ্যে আওরঙ্গজেব তার অন্যান্য ভাই যেমন দারা, সুজা প্রমুখকে যুদ্ধে বা কূটকৌশলে হারিয়ে দিয়ে মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আওরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮ সালে এবং তিনি ১৬৫৮ সালে সর্বশেষ শক্তিমান মোগল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আরাকান— বর্তমানে মায়ানমারের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। **আয়ত চোখ—** টানাটানা চোখ। **ঘাই—** আঘাত। **চাঁটাই—** হোগলার পাতা বা বাঁশের চটা দিয়ে বানানো আসন বিশেষ। **চিরন্তন—** চিরকালীন; চিরকালব্যাপী। **শাহসুজা—** আওরঙ্গজেবের ভাই এবং সম্রাট শাহজাহানের পুত্র। **বাদাবন—** চাষ না হওয়া জঙ্গলযুক্ত জায়গা। **বিষাদ—** স্বাদ নেই এমন। **শুকতারা—** সূর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে যে নক্ষত্র দেখা যায়। **পুঁথি—** হাতে লেখা পুরনো দিনের গ্রন্থ। **পিদিম—** প্রদীপ শব্দটির আঞ্চলিক রূপ। **পুবের সারে—** পূর্ব দিকের সারিতে। **তল্লিতল্লা—** বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের গাঁট; পোটলা-পুঁটলি। **নির্ভেজাল—** ভেজালহীন। **ধলপহর—** ভোর হওয়ার আগে যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে একটু একটু করে আলো ফুটে থাকে।



সারসংক্ষেপ :

কথিত আছে, কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কটি তৈরি করেছিলেন শাহ সুজা। সড়কের পাশের জলাভূমিতে ফুটে থাকে অসংখ্য শাপলা ফুল। ভোর না হতেই আশপাশের গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো অনেকেই আসে শাপলা তুলতে। মস্ত আর টুনি শাপলা তুলতে আসে আনন্দ পাবার জন্য। মস্ত টুনিকে ভয় দেখায় তাদের এই লুকিয়ে শাপলা তোলার ব্যাপারটি যদি বুড়ো মকবুল জানতে পারে তবে বিপদ হবে। যে পরির দীঘির পাড়ে বসে টুনি আর মস্ত বিশ্রাম নেয় আশপাশের গ্রামের লোকদের ধারণা, কোনো এক বৈশাখি পূর্ণিমারাত্রে আকাশ থেকে পরিরা নেমে এসে এক রাতের মধ্যে কেটেছিলো সে দীঘি। উদ্দেশ্য ছিলো, দীঘির পানিতে নেমে আনন্দ করা। এই পরির দীঘিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে অনেকগুলো গ্রাম। মোট আটঘর লোকের বাস মকবুলদের বাড়িতে। ছোট ছোট ঘর, বাঁশ আর তালপাতার তৈরি – একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে তার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালো। তাই বিয়েও করেছে তিন তিনটা। বড় বউ আমেনা— কালো, মোটা আর বেঁটে; বয়স ত্রিশের কোঠায়। মেজ বউ ফাতেমা – রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। সবার ছোট টুনি— গায়ের রং কালো, ছিপছিপে দেহ। বয়স তের-চৌদ্দর কাছাকাছি। তিন বউ আর বড় বউ আমেনার মেয়ে হীরনকে নিয়ে মকবুলের সংসার। বউদের দিয়ে সে চাটাই বোনায়, ধান মাড়াই করায়, জমি চাষ করায়, খেতের দেখাশুনা করায়। মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মায়ের; তার পাশেরটা আবুলের; তার পাশে রশিদের ঘর। সবার দক্ষিণের ছোট ঘরটায় থাকে মস্ত। একা মানুষ। লোকে বলে মস্ত খুব একগুয়ে আর বদমেজাজি; কিন্তু টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ আর হয় না। পশ্চিমের সারে দক্ষিণের ঘরটা মনুর; তার পাশে সুরত আলী আর সবার শেষে নির্ভেজাল মানুষ গনু মোল্লার ঘর।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পুঁথি কী?

- ক. মেশিনে ছাপা পুরনো দিনের পুস্তক
গ. হাতে লেখা পুরনো দিনের পুস্তক

- খ. হাতে লেখা আধুনিক কালের পুস্তক
ঘ. মেশিনে ছাপা আধুনিক কালের পুস্তক

৬. ‘স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার’ স্বপ্নে গেল চইলারে দুধের মতো সুন্দর কুমার, কিছু না গেল বইলারে।’ আশ্বিনার গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. আশা

খ. হতাশা

গ. আনন্দ

ঘ. অনুশোচনা



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয়ে করে জয়

তাহাদের পরিচয়

লিখে রাখে মহাকাল।

৭. উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন পথের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. গ্রান্ড ট্রাংক রোড

খ. আরাকান সড়ক

গ. ময়নামতি সড়ক

ঘ. মোঘলাই সড়ক

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হচ্ছে—

i. সাংস্কৃতিক পরিচয়

ii. অতীত ঐতিহ্য

iii. দার্শনিক পটভূমি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- শিকদার বাড়ি পত্তনের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- বউদের দিয়ে লাঙল টানানোর জন্য মকবুলের পরিকল্পনা বলতে পারবেন;
- টুনি আর মস্তুর লুকিয়ে মাছ ধরার কাহিনি লিখতে পারবেন;
- নারী নির্যাতনের একটি অমানবিক ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

দীঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।

কখন কোন যুগে পত্তন ঘটেছিলো এ গ্রামের কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু, এ বাড়ির পত্তন বেশি দিন আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।

সেই তেরশ’ সনের বন্যা।

অমন বন্যা দুচার জন্মে কেউ দেখেনি।

মাঠ ভাসলো, ঘাট ভাসলো, ভাসলো বাড়ির উঠান। ঘর ভাসলো, বাড়ি ভাসলো, ভাসলো কাজির কুশান।

কিছু বাদ নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু সব। এমন কি মানুষও ভাসলো। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।

তাল গাছের ডগায় ঝোলান বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিলো পুঁটি মাছের ঝাঁক।

রহমতগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হল।

বুড়ো কাসেম শিকদার ছিলো কুলাউড়ার বাসিন্দা।

বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিলো না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকা ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসান দিলো বুড়ো আর বুড়ি।

কলা গাছের ভেলায় চারদিন চার রাত। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। একেবারে উপোস। তেষ্ঠায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।

অবশেষে এসে ঠেকল এই দীঘির পাড়ে।

লাল পরি নীল পরি আর সবুজ পরি দীঘি। ছোটখাট একটা পাহাড়ের মতো উঁচু যার পাড়।

গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেলো কাশেম শিকদারের।

কলসি থেকে টাকা বের করে দুচার বিঘে জমি কিনে ফেললো সে। গোড়াপত্তন হল এ বাড়ির।

বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারকেলের গাছ লাগালো কাশেম শিকদার। পুকুর কাটলো। ভিটে বাঁধলো। পছন্দ এত ঘর তুললো বড় করে। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেল না সে। ছেলেপুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এত বড় বাড়ি।



মাঝে মাঝে চিন্তায় এত বিভোর হয়ে যেতো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকতো না তার। বুড়ি ছমিরন বিবি লক্ষ করতেন সব। বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন। তারপর, একদিন জলভরা চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরন বিবি। আন্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা কর। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। দুগুণ বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরন বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। ঘরটা লেপে মুছে নিয়ে নিজ হাতে বিছানা পাতলেন স্বামী আর তার নতুন বিয়ে করা বউ-এর জন্য। আদর করে হাত ধরে এনে শোয়ালেন তাদের। নতুন বউ-এর দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরন বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন কলজেটা কুটিকুটি করে কাটছিলো তাঁর। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুর পাড়ে ধূতরা ফুলের সমারোহ। গুনে গুনে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।

ধপাস ধপাস টেকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দুইজনে। মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপ চপ করছে ওদের।

সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।

বাড়ির ওপরের জমিটাতে লাঙল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পাবে সে সম্ভাবনা নেই। লাঙল অবশ্য যা হোক একটা আছে ওর। অভাব হল গরুর। গরু না হলে লাঙল টানবে কিসে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়। মকবুল ভাবল, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে, দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দেহ বউ দুইডা দিয়া লাঙল টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোনো লোকে দেখবার কোনো ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফত বিয়ে করেনি সে। পুরো চার চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে এক একটা বিয়ে করেছে। হুঁ।

ভাবছিলো আর সোনারঙ ধানগুলো টেকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিল মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আতর্নাদ করে হাতটা চেপে ধরলো সে। অসতর্ক মুহূর্তে টেকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। আল্লাহ বলে মুখ বিকৃত করলো মকবুল।

টুনি আর আমেনা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো টেকির ওপর। ঘোর কাটতে ছুটে নেমে এলো ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিলো মকবুল, দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপালো মকবুল।

আমেনা বললো, দেহ কারবার, নিজের দোষে নিজে দুঃখ পাইল আর এহন আমাগোরে গালি দেয়। আমরা কি করছি।

তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো মকবুল। তোরা দুই সতীনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে টেকি ফালাইছস। তোরা আমার দূশমন।

হ্যাঁ দূশমনই তো। দূশমন ছাড়া আর কি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো আমেনা। টুনি এগিয়ে গেলো ওর ফুলা হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে। লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলো মকবুল। দরকার নাই, দরকার নাই। অত সোহাগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিক ছুঁড়ে মারলো মকবুল।

বিষ উঠছে নাহি বুড়ার? এমন করতাকে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা বাতাসে দেহটা জুড়িয়ে গেলো ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। উঠোন থেকে মস্তুর ঘরের দিকে তাকালো ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মস্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা বালিশটা নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিলো মস্ত।

টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে!

মস্ত মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে ক্যান কী অইছে?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না?

মস্ত অবাক হয়, কই যামু?



টুনি মুখ কালো করে চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ক্যান ভুইলা গেছ বুঝি?

মস্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ-মাছ ধরতে?

যাইবা না? সপ্তশ্রী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।

মস্ত হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়ো যদি টের পায় তাইলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো।

হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মাইররে ডরাও নাকি?

মস্ত সে কথার জবাব না দিলে টুনি বলে, ভাত খাইছ?

না! তুমি খাইছ?

হঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আস যাও। জলদি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলান জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মস্ত।

ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনি বিবি কই গেলো, খাইতে আহ!

আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

আজকাল রাতের বেলা আমেনার ঘরে শোয় মকবুল। টুনি থাকে পাশের ঘরে। আগে, ফাতেমা আর ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকতো। মাসখানেক হল ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতেরবেলা ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই। রাত জেগে মাছ ধরাটা ইদানিং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকরি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে টুনি। জালে ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।

পর পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো দুজনে। জমির মুঙ্গির বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিলো কিন্তু চাঁদনী ছিলো না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিলো পুরো আকাশটা।

এক হাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে সন্তর্পণে ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে। পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয়নি মোটেও। কিন্তু পুকুর পাড় থেকে জোর গলায় আওয়াজ শোনা গেলো, কে কে জাল মারে পুকুরে?

এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে এক গলা পানিতে নেবে গেলো মস্ত। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। জমির মুঙ্গির হাতের টর্চটা বিদ্যুৎদ্বিগুণে ছুটে গেলো পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বার বার খোদাকে ডাকছিলো মস্ত, খোদা তুমিই সব।

একটু পরে পাড়ের ওপার থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, এই উইঠা আহ। মুঙ্গি চইলা গেছে। বলে খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে সে। ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠেছে মস্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে?

তারপর থেকে, আরো সাবধান হয়ে গেছে মস্ত। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ আপদ কখন কী ঘটে কিছুতো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটাকে আজ একবার ভালো করে দেখে নিলো মস্ত। তারপর বুনো লতার ঝোপটাকে দুহাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো সে। টুনি পেছন থেকে বললো, বারে অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কী কইরা? মস্ত জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললো, আস্তে আহ, তাড়া কিয়ের? টুনি বলে, বারে, আমার বুঝি ডর ভয় কিছুই নাই। যদি সাপে কামড়ায়? সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দুহাত পিছিয়ে আসে মস্ত। ভয় কেটে গেলে থুতু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকুে থুক দাও তাইলে কিছু অইবো না। কোনো রকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়িগুড়ো ছাড়া আর কিছু জুটলো না। মাছগুলো কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারে কাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, এত দূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না। টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো বাড়ি ফিইরা যাই। জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মস্ত আস্তে আস্তে বলে, চলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলো হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিলো মকবুল।



অনেকক্ষণ কী একটা বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। উঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দু'একটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে। মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিল আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে।

হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছাটা চেপে ধরলো আবুল। তারপর কোনো চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলো ওর তলপেটে। উঃ মাগো, বলে পেটটা দুহাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়লো হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল, আমার ঘরের ভাত ধ্বংস কইরা রাস্তার মানষের লগে পিরিত। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিল আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠলো, খবরদার আবুলিয়া, তুই যদি বউয়ের গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক। আমার ঘরনীর গায়ে আমি হাত তুলি কি যা ইচ্ছা করি, তুমি কইবার কে অ্যাঁ? পরক্ষণে আবুল জবাব দিলো, তুমি যখন তোমার ঘরনীরে তুলাপেড়া কর তখন কি আমরা বাধা দিই।

অমন কোনঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক নজর ওর দিকে তাকালো মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছেটা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো হালিমা তাই মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আর মাইরো না, মইরা যামু।

চুপ, চুপ তীব্র গলায় ওকে শাসিয়ে ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেয় আবুল। হেঁচকা টানে ওর পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা খুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। তালি দেয়া পুরান ব্লাউজটা আঁটসাঁট করে বাঁধা ছিলো, টেনে সেটোও খুলে ফেলে আবুল। তারপর দুপায়ে ওর নগ্ন দেহটাকে প্রচণ্ডভাবে মাড়াতে থাকে সে। বেড়ার সঙ্গে পুরান একটা ছড়ি ঝোলানো ছিলো। সেটা এনে হালিমার নরম তুলতুলে কপালে কয়েকটা আঁচড় টেনে দেয় আবুল। এইবার পিরিত কর। আরো পিরিত কর রাস্তার মানষের লগে। আহা। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইন্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দুহাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকালো সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুললো না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে। প্রথম বউটা ছিলো এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিলো মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দও করেনি। পিঠটা বিছিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। কিল, চাপড়, ঘুসি ইচ্ছেমতো মারতো আবুল।

একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই। প্রতিরোধ নেই।

শুধু আড়ালে নীরবে চোখের পানি ফেলত মেয়েটা।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হল ওর। জমাট বাঁধা কালো রক্ত। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেলো আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিলো বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দুবছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দুবছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিলো একটু বাচাল গোছের আর একটু রক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হতো না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রক্তে দাঁড়াতো।

হাজার হোক মেয়েতো। পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন? বাধা দিতে গিয়ে পরিণামে আরো বেশি মার খেতো জমিলা। ও যখন মারা গেলো আর ওর মৃতদেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিলো সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিলো অনেকেই। ওরে পাষাইন্যারে এমন দুধের মতো মাইয়াডারে শেষ করলি তুই। আয়েশা মারা যাবার পর অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিলো আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলো সারা উঠোনে। পাড়াপড়শিদের বলেছিলো, আহা বড় ভালো বউ আছিলো আয়েশা। আমি পাষাইন্যা তার কদর বুঝলাম না। আহা এ এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিনদিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরেনি আবুল। তিন রাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শিরা ভেবেছিলো ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এলো এবার। এবার ভালো দেখে একটা বিয়ে শাদি করিয়ে দিলে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করেছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।



দ্বিতীয় বউয়ের মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোনো মূল্য দেয়নি পড়শিরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত চণ্ড করিস না আবুইল্যা। তোর চণ্ড দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউয়ের দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো গা জ্বালা করে ক্যান? ওদের কথা শুনে ক্ষেপে ওঠে আবুল।

কপালে এক মুঠো ধুলো ছুঁয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তওবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আবুল।

পড়শিরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতর কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইলা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা? সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়। ঠিক কইছ বইচির মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও বা দরকার কী। ওর বউরে মারুক কি কাটুক, কি নদীতে ভাসায় দিক, আমাগো কী আছে তাতে?

সেদিন থেকে আবুলের সাথে পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ো মকবুল এক-আধটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আবুইল্যা, তোর কি মানুষের পরাণ না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে একটুও চোট লাগে না আবুইল্যা? বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মতো অত নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। মারবি তো মার। একটুখানি সইয়া মার। অপরাধের গুরুত্ব দেইখা সেই পরিমাণ মার। এ হল মকবুলের নিজস্ব অভিমত।

অপরাধ, এমন কোনো সাংঘাতিক করেনি হালিমা। পাশের বাড়ির নুরুন্নর সঙ্গে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিলো জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা জ্বালা করে উঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে উঠেছে মন।

এমন মন খোলা হাসি তো আবুলের সঙ্গে কোনোদিন হাসেনি হালিমা।

বেহুঁশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন সর্বাপেক্ষে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙ্গি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলো আবুল। মাটির হুকোটাকে নেড়েচেড়ে কী যেন দেখলো, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রশীদের বউ সালেহা উঠোনে বসে চাটাই বুনছিলো। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে মুখ টিপে হেসে বললো, বউ-এর পিরিত বুঝি আর সইলো না মিয়ার। আর সইবো, বহুত সইছি। মুখ বিকৃত করে পুরনো কথাটাই আবার বলে গেলো আবুল, আমার ঘরের ভাত খাইয়া রাস্তার মানুষের সঙ্গে পিরিত। তুমি কও ভাবী, এইডা কি সহ্য করন যায়?

হ্যাঁ তাতো খাঁটি কথাই কইছ। সালেহা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরনী যদি মনের মতো না হয় তাইলে কি তারে নিয়ে আর সুখে ঘর করন যায়?

আর ভাবী, দুনিয়াদারী আর ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে দুই চোখ যেই দিকে যায় চইলা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চুলায় আগুন আছে? একটুহানি আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলো সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে আবুল বললো, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা মালিশ কইরা দিও ওর গায়ে। হাড়ডি না দুই একখানা ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কাম কাজ কত পইর্যা রইছে। সব কিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা আগে খেয়াল আছিলো না মিয়ার? সালেহা মুখ বাঁকালো। কাম কাজের যখন ক্ষতি অইবো জান, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উঁহু, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আক্ষারা পাইয়া যাইতো।

আর আক্ষারা কি এমনে কম পাইছে? চারদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বললো, নুরুন্নর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে? ওতো রোজ রোজ কথা কয়।

কী? চোখ জোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের, আমারে এতদিন কও নাই ক্যান?

সালেহা বললো, কী দরকার বাবু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে অয়। তাকি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কী কথা কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াটা একেবারে ভুলে গেলো আবুল।

সালেহা আস্তে করে বললো, যাই কও বাবু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কী এই বউডা তোমার বড় ভালো অয় নাই। আমরা তো আয়শাকেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরা তো আমাগো হাতের ওপর দিয়েই গেছে।



ওগো তুলনা আছিলো না। কিন্তু হালিমার স্বভাব চরিত্র বাবু আমার বড় ভালো লাগে না। বলতে গিয়ে বার কয়েক কাশলো সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বললো, ইয়ে মানে, বাইরের মানুষের সঙ্গে হাসাহাসি আর ঢলাঢলি। একটুখানি লজ্জা শরমও তো থাকা চাই। কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো সালেহা। একটু ধমকের সুরে বললো, দেইখো বাপু, তুমি আবার মাইয়াডারে মারতে শুরু কইরো না। এমনিতেই বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর এ জন্মেও হইবো না। সালেহার কথাটা শেষ হবার আগে সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কল্কেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে আবার হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেলো ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিরাম— থামে না এমন। আস্কারা— প্রশয় দেয়া; লাই দেয়া। পত্তন— প্রতিষ্ঠা; আরম্ভ; সূত্রপাত। কুশান— ‘কুশাসন’ শব্দটির আঞ্চলিক রূপ; কুশ বা তৃণ দিয়ে তৈরি আসন। জানে খতম কইরা দিমু— প্রাণে মেরে ফেলবো। তেষ্ঠা— পিপাসা। বিভোর— আত্মহারা। দুগুণ— দুইগাল। মুফত— মাগনা; বিনামূল্যে। তীব্র আত্ননাদ— উচ্চ স্বরে চিৎকার। স্তব্ধ— নিশ্চল। ন্যাকড়া— ছেঁড়া কাপড়। রোষ— ক্রোধ; রাগ। চাঁদনি— জোছনা। বিদ্যুৎবেগে— দ্রুতগতিতে। বাজুর ওপরে— বাহুর ওপরে। সেয়ান— চালাক; চতুর। দাওয়া— বারান্দা। মৃদু— সামান্য। বাঁপি— বাঁশ দিয়ে বানানো বেড়া বিশেষ। বাচাল— যে অতিরিক্ত কথা বলে। বুদ্ধ— কঠোর; রস-কষহীন। উঠোন— প্রাঙ্গণ; আঙিনা। পাষাইন্যা— পাষণ শব্দের আঞ্চলিক রূপ। ঢঙ— ছলাকলা; ছলনা; ভান। সাচা কথা— সত্য কথা। গ্রহর-অন্তর— প্রত্যেক গ্রহরে। গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে— কণ্ঠস্বরটা একেবারে নিচু করে বা আস্তে করে। বানের জলে ভাসান দিল— বন্যার পানিতে ভেসে চলল। পৈশাচিক— পিশাচের মতো অমানবিক। লাউয়ের মাচা— লাউ গাছের জন্য বাঁশ কঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে বানানো উঁচু জায়গা। শত্রু বইনা— শত্রু হয়ে। শত্রুতামি— শত্রুতা শব্দের আঞ্চলিক রূপ। সন্তর্পণে— সতর্কতার সঙ্গে; খুব সাবধানে।



সারসংক্ষেপ :

দীঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ-গ্রাম। গ্রামের পত্তন নিয়ে নানা গল্প চালু আছে। মকবুলের দুই বউ আমেনা আর টুনি টেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল আর মকবুল ঠেলে দিচ্ছিল ধান। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় টেঁকি এসে পড়ে তার হাতে। মকবুল ভাবে, তার দুই বউ শত্রুতা করে এ-কাজ করেছে। রাতের বেলায় মস্তুর আর টুনি বের হয় জাল নিয়ে — উদ্দেশ্য পুকুরে পুকুরে লুকিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরে আনা। ইদানিং রাতে লুকিয়ে মাছ ধরাটা ওদের দুজনের কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। হালিমা আর আবুল সকাল থেকেই ঝগড়া বাঁধিয়েছে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আবুল রেগে গিয়ে হালিমার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে দেয়। তারপর লাউয়ের মাচার নিচ থেকে ঘরে এনে ঘরের বাঁপি বন্ধ করে দিয়ে মারতে থাকে। বউ পিটিয়ে আবুল যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়। এর আগেও দু-দুটো বউকে আবুল পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. বুড়ো কাশেম শিকদার কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন?

ক. কুশিয়ারা

খ. কুলাউড়া

গ. কসবা

ঘ. কাঠিগ্রাম

১০. বউকে নির্যাতন করে আবুল যে ধরনের আনন্দ পায়—

ক. পৈশাচিক আনন্দ

খ. গভীর আনন্দ

গ. অমানবিক আনন্দ

ঘ. হালকা আনন্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সাপুড়ীদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় তাবিজ বিক্রি করা। এ নিয়ে বিলাসীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক হত। বিলাসী বলত, আমাদের তো খাবারের অভাব নেই। আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই?

১১. উদ্দীপকের বিলাসী ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে কার কথা তুলে ধরে?

ক. মস্তুর মিয়া

খ. গনু মোল্লা

গ. করিম শেখ

ঘ. ইদন আলী



১২. উদ্দীপকের বিলাসী ও উপন্যাসের চরিত্রটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

i. অধিকার আদায়ে ii. মানসিক চেতনায় iii. দায়িত্ববোধে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- মস্তুর অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পুঁথি পাঠের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ‘কমলার পুঁথি’র কাহিনি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভূতে-ধরা সংক্রান্ত একটি লোকবিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলো টুনি।

এত শিঘ্রী উঠত না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকটা নিরাপদ মনে করলো না। মনে মনে বুড়োকে এক হাজার একশো অভিশাপ দিলো। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাটা ঘুরছে। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেলো। এক গলা পানিতে নেমে মস্ত গোসল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতগুলো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাটছে এপার থেকে ওপারে। আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে চ্যাপটা ঠোট দিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এক কোণে এসে নীরবে বসলো টুনি। পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এলো মস্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। মনে হল কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছু সঙ্গ লেগে চিরে গেছে পিঠটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলো টুনি, এই এই শোন। মস্তুর ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, অ্যাঁ?

মস্তুর হেসে দিয়ে বললো, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতার কাঁটা লাগছিলো পিঠে।

টুনির চোখজোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এলো। দরদ ভরা কণ্ঠে সে আন্তে করে বললো, চলো কচু পাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মস্তুর আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বললো, দূর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাক ওর কথায় ছেদ পড়লো।

কই টুনি বিবি, বলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি? রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেলো টুনি।

মস্তুর কোনো জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙ্গল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার খেতে কাজ করে মস্তুর। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোনো কোনো দিন আট নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি-বাড়ির মস্তুর শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিলো মস্তুর। নৌকায় পাল তুলে অনেক দূরের



গঞ্জে চলে যেতো ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিংবা মাল নিয়ে ফিরতো। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায় রোজগার অনেক বেশি।

মাচাঙের উপর থেকে আধ ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে মস্ত ভাবলো, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্কার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া-বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে তসবিহ হাতে নামাজ পড়তে চলছেন গনু মোল্লা। মোরগ হাঁসগুলো সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন উঠোনের এককোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার যার খোয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো মস্ত। মাঝি-বাড়িটা বেশি দূরে নয়।

সগন সেখের পুকুরটা বাঁদিকে রেখে ডান দিকে মিয়াদের খেজুর বাগানটা পেরিয়ে গেলে দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে দিয়ে দাঁড়াতে মস্ত শেখের গরু ঘরের পেছন থেকে একটা লোম উঠা হাড় বের করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিংকার জুড়ে দিলো। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো সে।

দেউড়ির সামনে বাঁশের উপর ঝুলিয়ে রাখা সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্‌ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো আশিয়া।

আরে মস্ত ভাই দেখি। কী খবর?

মস্ত বললো, করিম আছে নাহি?

মাথার চুলগুলো খোপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আশিয়া বললো, আছে।

আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।

কী জ্বর? কহন অইছে? মস্তর চোখে উৎকণ্ঠা।

আশিয়া আন্তে করে বললো, পরশু রাইত থাইকা অইছে। কী জ্বর তা কইবার পারলাম না।

মস্ত কী যেন চিন্তা করলো। তারপর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে আশিয়া পেছন থেকে ডাকলো, চইলা যাও ক্যান? দেখা কইরা যাইবা না? আশিয়ার পিছু পিছু হোগলার বেড়া দেয়া ঘরটায় এসে ঢুকলো মস্ত। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বললো, মস্ত মিয়া যে, তোমারে তো আইজ-কাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি না মইরা গেছি তাও তো খোঁজ-খবর নাও না মিয়া।

মস্ত প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, তারপর বললো, দেখা না অইলে কি অইবো মিয়া খোঁজ-খবর ঠিকই নিই।

কলকেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুকোটা মস্তর দিকে বাড়িয়ে দিলো আশিয়া। তারপর জিঙেস করলো পান খাইবা? মস্ত হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে নিতে বললো, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুকো টানলো সে। তারপর আসল কথাটা আলোচনা করলো ওর সঙ্গে। করিম শেখের সঙ্গে আবার কিছুদিনের জন্যে নৌকায় কাজ করতে চায় মস্ত।

শুনে খুশি হল করিম। বললো, নাওটারে একটু মেরামত করন লাগবো।

কাল পরশু একবার আইসো।

আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিল মস্ত।

করিম সঙ্গে সঙ্গে বললো, আহা যাও কই, বহ না।

না। রাইত অইছে যাই এইবার।

আশিয়া বললো, বহ মস্ত ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।

এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্টে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আশিয়া।

মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে।

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মস্ত। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট হাত শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করলো আশিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।

মস্ত বললো, না আইজ না। আর একদিন খামু। বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মস্ত।

পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেলো আশিয়া। মস্ত শুধালো তোমার আকা কই গেছে?

আশিয়া বললো, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই। ওর গলায় ক্ষোভ।

ওর মুখের দিকে এক নজর তাকালো মস্ত। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারলো। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নস্ত শেখ। আশেপাশের গ্রামে গত ত্রিশ বছর ধরে যত লোক মরছে সবার কবর খুঁড়েছে নস্ত শেখ। এ তার পেশা নয় নেশা।



আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলো মস্ত তখন সে অনুভব করলো বেশ রাত হয়েছে।
চারপাশে ঝাঁ-ঝাঁ পোকাকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে।

বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মস্তুর। কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙ্গিলো।

কইন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটা পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষেরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুক গুড়ুক হুকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গায়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া সে।

আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোনো সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজি কালুর পুঁথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।

ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন॥

কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ॥

আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দুকূলের পরি॥

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। তুলে তুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবায়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিলো কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে।

বড় সুখে দিন কাটছিলো ওদের।

এক বছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিলো ওদের।

আট বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাল পরি নীল পরি আর সবুজ পরির দীঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল কমলা। দীঘি দেখে পালকি থেকে নামলো সে। চৈত্র-মাসের খর রোদে ভীষণ তেপ্তা পেয়েছিলো ওর। দীঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হল কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁজল ভরে পানি খেলো সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখলো, চুলের মতো সরু কি যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলো। পারলো না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার এক প্রান্ত পানির ভেতরে, অন্য প্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিঁট আঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা। চারদিকে হই চই পড়ে গেলো।

কত লোক এলো। কত লোক গেলো।

কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হল। কেউ কিছু করতে পারলো না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেলো না চুলটা? তিন মাস তিন দিন চলে গেলো।

তারপরে- এক রাতে স্বপনে দেখিলো সুন্দরী।

দীঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী॥

সেইখানে আছে এক রাজপুত্র সুন্দর।

আসেক হইয়াছে তার কমলার উপর॥



কমলারে পাইতে চায় আপন করিয়া।

কমলার লাইগা তার কান্দিছে হিয়া॥

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেলো কমলার। কাঁদলো সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই।

দীঘির পানি থেকে চুলে টান পড়লো এতদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেমে গেলো কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরে ধীরে দীঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো কমলা সুন্দরী।

চাঁদ হেলে পড়ে পূব থেকে পশ্চিমে।

ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

তুলে তুলে পুঁথি পড়া শেষ করলো সুরত আলী।

হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন

কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন॥

ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।

দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া॥

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেক অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতা পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হুকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কী যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে হাত পা ধোয়ার জন্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় মস্ত। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ।

মাঝি-বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

রাত জেগে আজও ধান ভানছে আশিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভাটুইরে না দিয়ো শাড়ি,

ভাটুই যাবো বাপের বাড়ি।

সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কাণ,

পঞ্চ রঙের ভাটুইরে॥

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মস্ত। ছোট পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সব কিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হল না মস্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এত রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছে সে। পশ্চিম পাড়ের লম্বা পেয়ারা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটা। চারপাশে বার কয়েক ফিরে তাকালো সে। ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মস্ত। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।

পরনের কাপড়টার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের মোটা ডালটার সঙ্গে বাঁধলো হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেচিয়ে কী যেন পরখ করলো সে।

মস্তুর আর বুঝতে বাকি রইলো না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা-

এ দুনিয়াটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।

মস্ত এ মুহূর্তে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিলো না।

হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠলো হালিমা। পেয়ারা গাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

হয়তো, বাবা-মার কথা মনে পড়েছে ওর। কিসা, দুনিয়াটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়ত।

এর মধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখে হাসি পেলো মস্তুর। ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলো সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মস্ত।

একটা করণ উজির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো হালিমা। বড় বিষণ্ণ চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরলো না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো দুইজন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মস্ত দেখলো, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এত মার মেরেছে ওকে আবুল। মস্ত শিউরে উঠলো। তারপর কী বলতে যাচ্ছিলো



সে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলো হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো মস্ত।

পুকুর পাড় থেকে ফিরে এসে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুনগুন করছে টুনি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধালো, কোথায় গেছলো মিয়া। তোমারে আমি খুঁজি মরি।

শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও কী নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

সুরত আলীর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবুল আর হালিমার ঘরেও কোনো বাতি নেই।

মস্ত সহসা টুনির কথার কোনো জবাব দিলো না।

টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বললো, এহনি ঘুমাইবা বুঝি?

মস্ত বললো, হুঁ শরীরটা আইজ ভালো নাই।

ক্যান, কী অইছে? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো?

মস্ত বললো, না এমনি খরাপ লাগতাকে।

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে করে বললো, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না?

মস্ত বললো, আইজ থাক, কালকা যামু।

টুনি কী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

তাই নাই?

হুঁ। বাপজানের অসুখ, তাই।

অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলো? ওর মুখের দিকে তাকালো মস্ত।

টুনি আস্তে করে বললো, বাপজানে লোক পাঠাইছিলো।

অ। উঠোনের মাঝখানে দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। একটু পরে মস্ত নীরবতা ভাঙলো, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতেছি।

কোনহানে যাইবা? টুনি সোৎসাহে তাকালো ওর দিকে।

মস্ত বললো, কোনহানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেইহানে নিয়া যায় সেইহানেই যামু।

টুনি বললো, তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা? বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।

সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না মস্ত। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মস্ত।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো মস্তর।

বাইরের উঠানে তখন কী একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভিড়।

গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কী প্রথমে বুঝতে পারলো না মস্ত। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হিরনের কাছ থেকে শুনলো সব।

মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারির ছোট ভাইকে সামনে পেয়ে মস্ত শুধালো, কী মিয়া ভূতে পাইলো কহন অ্যাঁ?

ব্যাপারির ভাই আদ্যোপান্ত জানালো সব।

কাল ভোর সকালে পরির দীঘির পাড়ে শুকনো ডাল পাতা কুড়োতে গিয়েছিলো মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল মেয়ে আর ফিরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোনো বিপদে পড়লো। প্রথমে ওকে দেখলো কাজি বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেঁতুল গাছের মগড়ালে উঠে দুপা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা শরমের কি মাথা খাইছ? দিন দুপুরে গাছে নাহি উঠা গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়্যা, বলি লজ্জা শরম কি সব উঠা গেছে দুনিয়ার ওপর থাইকা?

বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না।



খবর শুনে মজু ব্যাপারি নিজে ছুটে এলো দীঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়ের নাম ধরে বারবার ডাকলো সে। সখিনা, মা আমার নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।

বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিলো সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বললো, আর যামু না আমি। এইহানে থাকুম।

ওমা কয় কী। মাইয়্যা আমার এই কী কথা কয়? মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেলো মজু ব্যাপারির।

থুরথুরে বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। সহসা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লো সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারি। মাইয়্যারে তোমার ভূতে পাইছে।

খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো সখিনা। বেশি বক বক করলে ঘাড় মটকাইয়া দিমু।

এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না।

বুড়ি বললো, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।

লোকজন ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কারণ হাঁক-ডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বললো, দাঁড়িয়া তামাশা লেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না ওপরে। কে উঠবে, কে উঠবে না তাই নিয়ে বচসা হল কিছুক্ষণ। কারণ, যে কেউ তো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে উপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হল তকু ব্যাপারিই উঠবে ওপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।

তকু ব্যাপারিকে উপরে উঠতে দেখে ক্ষেপে গেলো সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগলো সে, খবরদার খবরদার ব্যাপারি, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোট ছোট ডাল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুঁড়ে মারতে লাগলো সে। তারপর অকস্মাৎ এক লাফে দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা। অনেক কষ্টে দীঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হল তাকে।

কলসি কলসি পানি ঢালা হল মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সখিনার তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলেনি সখিনা। একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি সে। তাই আজ সকালে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে যদি ভূতটাকে কোনো মতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারির ভাইয়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনলো মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা সাদা কাপড়কে সরষের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপর গনু মোল্লা ধরছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহান থাইকা আইহুস শিগ্গির কইরা ক, নইলে কিস্তক ছাড়মু না আমি। ক শিগ্গির। সখিনা নীরব।

তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোনো কথাই বলছে না।

মন্তু আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘরের পেছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটে চলে গেলো সে। পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছের নিচে লাউ গাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটাই গতকাল রাতে ওই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগলো হালিমা।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অদৃশ্য— যা দেখা যায় না। অবিশ্রান্ত— শ্রান্তিহীনভাবে; একটানা। অকস্মাৎ— হঠাৎ; সহসা; অতর্কিতভাবে। আদ্যোপান্ত— আগাগোড়া; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে— যখন আকাশ জোছনার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। আট বেহারার পালকি— যে পালকি আটজন লোক ঘাড়ে করে নেয়। আঁজল— দুই হাত এক করে; অঞ্জলি। উৎকর্ষা— ব্যাকুলতা; চিন্তা; ভাবনা। উৎকর্ষ— শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকা। খোয়াড়— বাঁশ বা টিন দিয়ে বানানো হাঁস মুরগি রাখবার ঘর। ইতস্তত— সঙ্কোচ; দ্বিধা। ছাইয়ের গাদা— ছাইয়ের স্তুপ। দাঁতন করা— দাঁত মাজা। মরশুম— মৌসুম। লাকড়ি— খড়ি; জ্বালানী কাঠ। দেউড়ি— বাড়িতে ঢোকান প্রধান পথ। হোগলা— তিনকোণা ও চ্যাপ্টা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ; এগুলো দিয়ে সাধারণত ঘরের বেড়া দেয়া বা পাটি বানানো হয়। নাও— নৌকা। মৃদু মন্দ— নরম ও মধুর। প্রান্ত—



সীমা; কিনারা; একপাশ। বিষণ্ণ— দুঃখিত; স্তান। শুধাল— জিজ্ঞেস করল; জানতে চাইল। সহসা— হঠাৎ; অকস্মাৎ।
বিজ্ঞের মতো— পণ্ডিতের মতো; জ্ঞানীর মতো। শাসাতে লাগল— সাবধান করতে লাগল। স্বচ্ছ— পরিচ্ছন্ন; পরিষ্কার।



সারসংক্ষেপ :

মস্ত পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। এখন ক্ষেতের কাজ নেই। তাই করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে নৌকা চালানোর কাজের কথা বলে। আমিয়া করিম শেখের বোন। আমিয়ার পীড়াপীড়িতে অনেকক্ষণ বসে থেকে রাত করেই সে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে দেখে সমস্ত উঠান জুড়ে জটলা পাকিয়ে বাড়ির সবাই সুরত আলীর পুঁথি পড়া শুনছে। আজ সে কমলার কিছা শূনাচ্ছিল সবাইকে। পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসবার সময় মস্ত দেখতে পায়, আবুলের বউ পুকুর পারের পেয়ারা গাছে তার পরনের শাড়ির এক কোণা শক্ত করে বাঁধে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই গাছে বাঁধা শাড়ির কোণা খুলে নিয়ে পেয়ারা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে হালিমা আপন মনে কেঁদে ওঠে। এ-অবস্থায় মস্ত তার দিকে এগিয়ে যায়; পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে। জোছনার আলোয় দেখতে পায় মার খাওয়া হালিমার চোখ নাক ফুলে আছে। টুনি তার বাবার অসুস্থতার খবর মস্তকে দিয়ে বলে, আগামী পরশু সে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মস্তও জানায়, পরশু থেকেই সে করিম শেখের নৌকা বাইতে যাবে। পরদিন সকালে উঠোনে একটা বড় জটলা দেখতে পায় মস্ত। মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত ছাড়ানোর জন্য তাকে গনু মোল্লার কাছে আনা হয়েছে। দাঁত মাজতে মাজতে পুকুর পাড়ে গিয়ে মস্ত দেখলো, হালিমা গত রাতে যে পেয়ারা গাছে শাড়ি জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল সে গাছেই লাউয়ের মাচা বাঁধছে। কে বলবে গত রাতে এই হালিমাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. ‘ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি’ পাঠ করে কে?

ক. গাজী কালু

খ. সুরত আলী

গ. নস্ত শেখ

ঘ. করিম শেখ

১৪. সকলে গনু মোল্লার বাড়ির সামনে যে কারণে ভিড় করেছিল—

ক. আমেনা ও সালেহার ঝগড়া দেখতে

খ. গনু মোল্লার দোয়া নিতে

গ. মজু ব্যাপারীর ভূতহস্ত মেয়েকে দেখতে

ঘ. অসুস্থ মকবুলকে দেখতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পুঁথু। আবছা আলোয় মেয়েটিকে চিনতে ভুল হয় না তার। জাম গাছটিকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদছে। উপরে লটকে রয়েছে ফাঁস নেয়ার দড়িটি। মেয়েটি কেন যেন তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে।

১৫. উদ্দীপকের ‘মেয়ে’টি উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. ফাতেমা

খ. হালিমা

গ. আমেনা

ঘ. সখিনা

১৬. উদ্দীপক ও উপন্যাসের চরিত্র —এ দুটির মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ—

i. জীবনে হতাশায়

ii. জীবনকে ভালবাসায়

iii. জীবনে দুঃখবোধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii



পাঠ-৫



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- নৌকার মাঝি হিসেবে মস্তুর জীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বিয়ে প্রসঙ্গে মস্তুর মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কুটুম-বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মস্তুর আচরণগত পরিবর্তনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- টুনিদের বাড়ির পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

নৌকোটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে আসে ওরা। মস্তুর আর করিম শেখ। হাটের এক কোণে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানে বসে গরম দুকাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাট। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসে সওদা করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারি জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোট ছোট হাট বাজারের দোকানিরা দোকান চালায়।

মাঝে মাঝে দুএকটা সার্কাস পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগণায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানিদেরও তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদীর পাড়ের ভরা জায়গাটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে। মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এ হাটে এলে একমাত্র হাজির দোকানেই চা খায় করিম। হাজিও বাইরের কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকায় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজি একমুখ হেসে শুধালো, কী মেয়া খবর সব ভালো তো?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আর খবর, হাঁপানি হয় মরতাই।

আহা, ওইডা আবার কখন থাইকা হইলো? হাজির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মেয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলেই পারত।

কী আর কইমু ভাই। পেট তো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বললো, পেটতো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

মস্তুরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

তারপর আবার নৌকায়।

যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় ওদের। করিম শেখ হাল ধরে বসে থাকে। মস্তুর দাঁড় বায়। আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দুপাশের গ্রামগুলো। মাঝে মাঝে দুএকটা মিটমিটে বাতি দেখে বোঝা যায় গেরস্থদের বাড়ি গেলো একটা। কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় হাট থেকে ফিরছে ওরা, হাটুরের দল।

মাঝে মাঝে দুএকটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটানা কলকল শব্দ। হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মস্তুর।

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও। হাত বাড়িয়ে হুকোটা নেয় মস্তুর। গুড়ক গুড়ক টান মারে হুকোতে।

তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিলো মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

ও বলে, এইবার একডা বিয়া শাদী করমু ঠিক করছি। একা একা আর ভালো লাগে না। মস্তুর গান থামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো করে দেখতে পায় না সে।

করিম শেখ আবার বলে, কী মিয়া কিছু কও না যে?



মস্ত বলে, বিয়া করবা সেতো ভালো কথা।

করিম শেখ বলে, করবার তো ইচ্ছা হয়, করি কারে? ভালো দেইখা একটা মাইয়া দেহায়া দাও না।

মস্ত হাসে, বলে, ভালো মাইয়া পাইলে কি আর নিজে এতদিন অবিয়াত থাকি মিয়া। বলে আবার গান ধরে সে।

আশা ছিলো মনে মনে।

বাড়ি ফিরে এসে মস্ত দেখলো বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোটখাট জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলাও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনোদিন কোনো কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দুটোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মান সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মস্তকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা, বহ মস্ত মিয়া বহ।

আলোচনার ধারাটা মুহূর্তে বুকে নিলো মস্ত। বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্থ ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিলো একবার। মাস তিনেক হল বউ মারা গেছে।

আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা আর কী অইবো; পাকা কথা দিয়া দ্যান। গনু মোল্লা বললো, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকবো। বড় বেশি বাছ বিচার কইরো না।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।

হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠলো, আমাগো মস্ত মিয়ারেও এইবার একটা বিয়া করাইয়া দ্যান। এক কোণে নীরবে বসেছিলো মস্ত। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো।

বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বললো, হ, ঠিক কথা কইছ সালেহা।

ওর লাইগা একটা মাইয়া দেহন লাগে।

আমেনা বললো, ওর তো বাপ-মা কেউ নাই, আপনারা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।

সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করলো ওরা।

ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মতো সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ।

বয়স তের চৌদ্দ হবে।

আবুল বললো, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেমন ছরপরি। তাই মামা আদর করে পরি বলে ডাকে। শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়।

খায় একটু বেশি। আর ঘুমোয়। মকবুল পরক্ষণে বললো, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া। আমেনা বললো, অত দূরে দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আন্দিয়া কী খারাপ মাইয়া নাই। ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাটাবার পারে। মস্ত মিয়ারে সুখে রাখবো। আন্দিয়ার প্রপ্নে কারো কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেলো না। ও মেয়ে গতর খাটতে পারে এ কথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে ও নয়।

মকবুল বললো, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মস্তও মরবো।

মস্ত কিন্তু একটা কথাও বললো না। সে চুপ করে বসে রইলো এক কোণে। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মতো উঠে গেলো সবাই। একটু পরে যে যার ঘরে চলে গেলো ওরা।

পিদিম জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হল মস্ত। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিলো মস্ত।

আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। এক টুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো মস্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের উপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিলো মস্ত।

কিছুদিন ধরে শীত পড়তে শুরু করেছে।



দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষ রাতে প্রচণ্ড শীত, হাড় কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাড়ে ভুসির আগুন জ্বলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটাকে উষ্ণে দেয়। আজকাল ভোর হওয়ার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মস্ত। সোয়া দুটাকা দিয়ে কেনা খদ্দেরের চাদরটা গায়ে মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি-বাড়ির দিকে ছোট্টে সে। ক'দিন হল করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুক খুক করে কাশে আর লম্বা শ্বাস নেয়।

মস্ত বলে, একডা কোবিরাজ দেহাও মিয়া।

করিম বলে, কিছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।

আমিয়া বলে, হাটে গঞ্জে যাও ভালো দেইখা ডাকতর দেখাইতে পার না?

করিম শেখ চুপ করে থাকে কিছু বলে না। আজ সকালে মাঝি-বাড়ির দিকে সবে রওয়ানা দিয়েছে মস্ত। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বললো, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মস্ত মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইবো আজই।

বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে ওদের, খাতির যত্ন করতে হবে। আদর আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা।

মস্তর উপরে আরো একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

দুএক দিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মস্ত। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে। পথের দুপাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় সকালে সতেজ হয়ে উঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।

মাঝি-বাড়ির দেউড়ির সামনে আমিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মস্তর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোছল করে ফিরছে সে। ঘন কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আমিয়া বললো, মস্ত ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।

মস্ত বললো, এই সকাল বেলা গোছল করছো তোমার শীত লাগে না? আমিয়া একটু হাসলো শুধু। কিছু বললো না।

সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল সকাল গোসল করে নিয়েছে আমিয়া। খেয়ে দেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে সে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া বাড়ি চলে যাবে আমিয়া। ধান ভানবে, সারারাত।

মস্তকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে এক বাসন পিঠা এগিয়ে দিলো আমিয়া। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বললো, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করলো সে। আমিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝে মাঝে বুড়ো মস্ত শেখের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে সে।

বেড়ার খুপরি দিয়ে ওকে দেখতে লাগলো মস্ত। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন। আঁট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। আজ আমিয়াকে বড় ভালো লাগছে মস্তর। চোখের পলক জোড়া ঈষৎ কেঁপে উঠলো। হ্যাঁ, আমিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সে পরে দেখা যাবে। বুড়ো মকবুলকে আজকেই ওর মনের কথাটা জানিয়ে দেবে মস্ত। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসলো সে।

করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বললো, কী মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে? মস্ত তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বললো, হুঁ হুঁ এইতো খাইতাছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাসনটা শূন্য করে দিলো মস্ত। কাঁথাটা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বললো, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মস্ত বললো, মরণের কথা চিন্তা কইরতে নাই। আয়ু কইমা যায়।

করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগে।

রাতে এলো ওরা।

বরের মামা, চাচা আরো দুতিনজন লোক।

হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।

মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাস পেতে বসানো হল ওদের।

গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।



আবুল, রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসলো সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। বলছিলো, তোমরা সবাই আছ, ভালো মন্দ যা বুঝা আলাপ কর গিয়া। আমাদের ওর মধ্যে টাইনো না। রশীদ বললো, কী কথা, আপনার মাইয়া আপনে না থাকলে চলবো কেমন কইরা?

ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়লো, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান?

অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো মকবুল। প্রথমে মেহমানদের ভাত খাওয়ান হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের। মস্ত্র এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলো কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথাটা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মস্ত্র। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেলো না।

সারা বাড়িতে আজ ভিড়।

রান্না ঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না। হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা।

হঠাৎ মস্ত্রকে সামনে পেয়ে আমেনা জিঙেস করলো, মানুষ ক'জন?

মস্ত্র বললো, আটজন।

আটজন! আমেনার মাথায় রীতিমতো বাজ পড়লো। আটজনের কি ভাত রানছি আমি? আমি তো রানছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়ে আমারে চাইরজনের কথা কইছিলো।

বড় ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে আসছিলো মকবুল, কথাটা কানে গেলো ওর। পরক্ষণে ভিতরে এসে রাগে ফেটে পড়লো সে। আমি কি জাইনতাম, আটজন আইব ওরা? বারবার কইরা কইয়া দিছি চাইরজনের বেশি আইসেন না আপনারা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন— বলে ঠোঁটজোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করলো মকবুল, হালার ভাত যেন এই জন্মে দেহে নাই হালারা।

হইছে হইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেঝে বউ ফাতেমা চাপা গলায় বললো, যান যা আছে তা দিয়ে একবার খাওয়ান। আমরা না হয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল মকবুল, মস্ত্রর দিকে চোখ পড়তে বললো, তাইলে মস্ত্র মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন?

মস্ত্র সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো।

নিজের কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এলো। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাটা মকবুলকে বলাবে মস্ত্র।

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসলো সবাই।

প্রথমে উঠলো দেনা-পাওয়ার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বললো, অলঙ্কারপত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুই জোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা রুমকা।

গলার আর কমরেরডা দিবো কে? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওইগুলোও দিতে অইবো আপনোগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিলা ক্যান মিয়া, অ্যাঁ? আবুল জোরের সঙ্গে বললো, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগবো।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসলো। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো সে।

বরের মামা আরব পাটারী মৃদু হেসে বললো, এই বাজারে এতগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া।

আরো একটু কম সম কইরা ধরেন। আচ্ছা, পায়েরটা না হয় নাই দিলাম। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিলো রশীদ।

বাকিগুলান তো দিবেন? হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বললো, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছে না রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির কী দরকার?

মকবুল কিছুই বললো না। একপাশে বসে রইলো চুপ করে।

গনু মোল্লাও নীরব। নীরবে শুধু তছবিহ পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠলো।

ইদন শেখ বললো, সব ব্যাপারে আপনাগোড়া মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিন্তুক আমাগোড়া মানতো অইবো।



আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকালো।

ইদন বললো, মোহরানাডা পাঁচ টাকাই ধরেন।

পাঁচ টাহা? অ্যাঁ পাঁচ টাহা? কন কী? রীতিমতো ক্ষেপে উঠলো সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি? অ্যাঁ। মাইয়ার কি কোনো দাম নাই?

আহ, দাম আছে বইলাই তো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাহার উপরে উঠতাম। আবার পাটারীর কর্তৃস্বরে বিরক্তি বারে পড়লো। কর্তৃস্বরে বিকৃতি এনে সে বললো, সঞ্চল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আট আনা বাড়ায়া দিলাম। মোট সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতক্ষণে কথা বললো বুড়ো মকবুল। এত কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না, বলে হঠাৎ কেন্দ্রে উঠলো সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দুহাতে চোখের পানি মুছলো মকবুল।

বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেলো সবাই। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগার টাকায় মিটমাট হল সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেলো। মনে মনে খুশি হল মকবুল। সোয়া এগার টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি।

নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ার নোঙর ফেললো মস্ত।

খাল পাড়ে উঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল-নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকা থেকে নামার আগে মুখ হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিলো মস্ত। পুরনো লুঙিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙিটা পরল, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিলো সে। তারপর খদ্দেরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাত্তা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকা থেকে নেমে এলো মস্ত।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করলো।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বার বার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মস্ত এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল মস্ত। পথঘাট জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের সময় একবার এসেছিলো সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তায় দুচারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুর উড়ে যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকের লোকেরা এর মধ্যে খেজুর গাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন চারজন গাছনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মস্তর।

ধারালো বাটাল দিয়ে গাছ কাটে ওরা। তারপর মাটির কলসী ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মস্তর প্রথম দেখা হল সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধ্যাবেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো সে।

মস্তকে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, মস্ত মিয়া না? কী মনে কইরা? মস্ত এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করলো ওর। তারপর বললো, ভাইজান পাঠাইছে, টুনি ভাবীয়ে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে আবার গোয়ালঘরের দিকে চলে গেলো মোতালেব শিকদার। একটু পরে আবার ফিরে এলো সে। বললো, আয়েন ভিতরে আয়েন। টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলো মস্ত, তারপর শিকদারের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে এগিয়ে চললো সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা। ভেতর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে মস্ত দেখলো, ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারা মুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মস্তকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো শিকদার।

রসুই ঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলেন বাইরে। মস্ত সালাম করলো তাকে।



মা বললেন, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচৌকি আইনা দে, বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসলো মস্ত।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইলো। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগলো সে।

টুনির মা বললো, টুনি তো কদিন ধইরা যাওনের লাগি উখাল পাতাল লাগাইছে।

উঁ যাইবো। যামু না আমি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো টুনি।

মা বললো, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার ওজুর পানি দাও।

মস্তুর জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেলো টুনি। মা-ও গেলো একটু পরে, বললো তরকারিটা নামায়া আই।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিলো মস্ত। এক বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। উঠোনের কোণে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ ছিলো। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের এ পাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিলো না। আগে গোয়ালঘরটা পুকুরের পূর্ব পাশে ছিলো, এখন সেটা উত্তর পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।

টুনি এসে এক ঘটি পানি রাখলো ওর সামনে আর এক জোড়া খড়ম। বললো, হাত-মুখ ধুইয়া নাও।

মস্ত মুখ হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বললো, চল ভেতরে চল, বাইরে শীত পড়তাছে।

মস্ত কোনো কথা বললো না। শান্ত শিশুর মতো ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেলো সে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোট ছোট দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বললো, এইডা আমার ঘর।

ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো মস্ত। ছোট ঘর মালপত্র ভরা। কয়েকটা বড় বড় মাটির ঘটি এক কোণে রাখা, তার পাশে তিন চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির উপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দুটি ছোট ছোট টিনের প্যাটরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গে একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের উপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তার পাশে বেড়ার সঙ্গে একটা ভাঙ্গা আয়না ঝোলান। উত্তর কোণে একটা দড়ির সঙ্গে ঝুলছে টুনির দুখানা শাড়ি, একটা ময়লা কাঁথা। তাছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা। মস্ত মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিলো পুরো ঘরটার ওপর। টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বললো, এইখানে বও।

মস্ত বসলো।

কিছুক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বললো, অমন শুকায়া গেছ ক্যান?

মস্ত পরক্ষণে বললো, কই না, শুকাই নাই তো।

টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মস্তুর মনে হল এ ক'মাসে টুনি অনেক পাল্টে গেছে।

রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হল।

ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিলো। বালিশটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলো। তারপর বললো, আর বইসা থাইকো না শুইয়া পড়।

মস্ত বললো, বেহান রাইতে কিন্তুক রওয়ানা দিতে হইবো।

ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিলো টুনি।

বললো, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমেই আবার বললো, সে কম কইরা অইলেও তিনদিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগবো। তারপরে যাওনের নাম।

মস্ত বললো, পাগল অইছ? তাহলে ভাইজানে মাইরা ফালাইবো আমারে। করিম শেখের নাও নিয়ে আইছি- আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে। টুনি বললো, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলো সে। কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়লো মস্ত। করিম শেখের কথা মনে হতে আশ্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।

এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে টুনিকে সব বলবে মস্ত। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো মস্ত।



ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। রাতের গভীর অন্ধকারে সে অনুভব করলো একটা হাত তার চুলগুলো নিয়ে খেলছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলো মস্ত।

গনু মোল্লার কাছ থেকে নেয়া তাবিজটা বাহুতে বাঁধা আছে কিনা দেখলো। তারপরে কে যেন চাপা স্বরে ওকে ডাকলো, এই। সহসা কোনো সাড়া দিলো না মস্ত।

হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো সে। নরম তুলতুলে একটা হাত। একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেলো, উঃ এই।

পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিলো মস্ত। টুনি?

ইস, কথা কয়ো না। মায় হুব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে করে বললো, চুপ শব্দ কইরো না। শোন, চুপচাপ উইড্যা আইও আমার সঙ্গে।

কিছু বুঝে উঠতে পারলো না মস্ত। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। একটু পরে টুনির পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এলো মস্ত।

বাইরে এসে দেখলো টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দুজনে রীতিমতো কাঁপছিলো ওরা।

মস্ত প্রশ্ন করলো, কী, কী অইছে?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও। ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চললো তাকে। বার বাড়িতে এসে মস্ত আবার প্রশ্ন করলো, কই চললা?

টুনি শব্দ করে হাসলো, আবার বললো, কলসী গলায় দিয়া দুইজনে পুকুরে ডুইবা মরুম চল। তারপরেই মস্তর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহসা প্রশ্ন করলো সে, আমার সঙ্গে মরতা পারবা না?

কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না মস্ত। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার হেসে উঠলো টুনি। হাসির দমকে দেহটা বারবার দুলে উঠলো তার। বললো, ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মরুম না। বলে আবার চলতে লাগলো সে।

এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলো মস্ত যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে না যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁত লেগে এলো ওর।

একটা লম্বা খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো টুনি। কলসিটা মস্তর হাতে দিয়ে বললো, এইটা রাখ হাতে তারপর পরনের শাড়িটাকে লুঙির মতো গুটিয়ে নিলো সে। মস্ত কাঁপা গলায় শুধালো কী কর?

ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুর গাছটা বেয়ে ওপরে উঠে গেলো সে।

মস্তর মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে।

একটু পরে এক হাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্য হাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার ওপরে যাচ্ছিলো টুনি। মস্ত বললো, আরে কী কর। গাছ এখন পিছল। পইড়া যাইবা।

পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসলো টুনি। বললো, ইস কত উঠছি। পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মস্তর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ওদের। মস্ত একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেলো ওরা।

টুনি নেবে এসে বললো, কারে ধমকাও?

মস্ত আস্তে করে বললো, শিয়াল।

আরো অনেকগুলো খেজুর গাছ থেকে রস নাবিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। শীতের রাতে কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশি দূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মস্তর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বললো, শীত লাগতাকে বুঝি?

মস্ত কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তোমার লাগে না?

টুনি বললো, উঁহ। বলে মাথাটা দোলালো সে।

মস্ত বললো, রস দিয়া করবা কী?

টুনি বললো, সিন্নি রান্দুম।

মস্ত কোনো কথা বলার আগেই টুনি আবার বললো, তোমার নায়ে চলো।

মস্ত অবাক হল, নায়ে গিয়া কী করবা?



টুনি নির্লিপ্ত গলায় বললো, সিন্ধি রান্দুম?

মস্ত বললো, পাগল হইছ?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, হুঁ। বলে মস্তর মুখের দিকে তাকালো সে, কই নাওয়ে যাইবা না?

মস্ত কঠিন স্বরে বললো, না।

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। রস গড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বোবা হয়ে গেলো ওরা।

কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরলো না।

মস্ত নীরবে তাকিয়ে রইলো, ভাঙা কলসির টুকরোগুলোর দিকে। টুনি মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুর পাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠলো।

টুনি আস্তে করে বললো, চল ঘরে যাই, চল।

মস্ত কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো শুধু।

পরদিন যাওয়া হল না মস্তর।

টুনির মা বললো কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যখন যাইতে দিমু তখন যাইবা। অগত্যা থেকে যাওয়া হল।

সারাদিন একবারও কাছে এলো না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিলো সে। ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে গিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।

তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলছে, কইরে টুনি এইদিকে আয়। মস্ত মিয়াকে ভাত বাইড়া দে। তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে।

রাতেরবেলা হঠাৎ বেঁকে বসলো টুনি। বললো, কাল সকাল বেলাই চইলা যামু আমি।

জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।

মা বললো, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।

টুনি বললো, না মস্ত মিয়ার কাম-কাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।

মা বললো, না মস্ত মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজি আছে।

টুনি তবু বললো, না কাল সকালেই চইলা যামু।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনলো মস্ত।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অজুহাত— কারণ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যে কারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আশঙ্কা— ভয়; সংশয়। আন্তরিকতার সুর— সহমর্মিতাসহ। কাতরোক্তি— কষ্ট বা যন্ত্রণায় লোকে যে ধরনের শব্দ করে। কুপি— খোলা বাতি। কুটুম বাড়ি— আত্মীয় বাড়ি। খুচরো— পরিমাণের দিক দিয়ে ছোট, সামান্য। খড়ম— কাঠের তৈরি পাদুকা বিশেষ। খাতির— সুসম্পর্ক। খুপরি— ছোট ছোট ফাঁক-ফোঁকর। গতর খাটাবার পারে— অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারে। গেরস্থ— গৃহস্থ শব্দের কথ্যরূপ। ডিঙিয়ে— পার হয়ে, অতিক্রম করে। পাইকারি— এক সঙ্গে অনেক জিনিস কেনা বা বেচা। পরগনা— কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। দোচালা ঘর— দুই চাল দিয়ে বানানো ঘর। হাঁপানি— শ্বাস কষ্ট জনিত রোগ বিশেষ। একসার— অনেকগুলো বাতি। প্রতিধ্বনি— কোথাও আঘাত পেয়ে আবার যে শব্দ হয়। উদাস— উন্মনা, এলোমেলো। হুরপরি— পরম সুন্দরী। মাচাঙ— বাঁশের তৈরি উঁচু জায়গা যেখানে বাসন কোসন বা গৃহস্থালির জিনিসপত্র রাখা হয়। ম্লান— মলিন বা বিষণ্ণ। ভাঁড়— মাটির তৈরি পাত্র। ভূসির আগুন— কাঠের বা গম; চাল, ডাল ইত্যাদির খোসা বা চোকলা দিয়ে জ্বালানো আগুন যা অনেকক্ষণ ধরে তাপ দেয়। ডাকতর— ডাক্তার শব্দের আঞ্চলিক রূপ। সতেজ— বলবান। পরক্ষণে— পর মুহূর্তে। বিড়বিড় করে— শব্দ না করে; অনুচ্চ স্বরে। ফরাস— মেঝেতে পেতে বসার জন্য কাপড়। হাঁক ছাড়ল— শব্দ করে বা উচ্চ স্বরে ডাকল। রান্ধি—



রেখেছি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। বিকৃতি— অস্বাভাবিক। মোহরানা— দেনমোহর। অপ্রতিভ— বিব্রত; কী করতে হবে বুঝতে না পারা। নোঙর— শিকল বা কাছির সাথে বাঁধা লাঙলের আকৃতির লোহার ভারী অঙ্কুরবিশেষ। ঈষৎ—সামান্য। বিস্ময়— আশ্চর্য; অবাক। গাছুনি— খেজুর গাছ কেটে রস বের করে যারা। বাটাল— লোহার তৈরি ধারাল অস্ত্র। হা করে— অবাক হয়ে। ঠেঙাতে ঠেঙাতে— তাড়াতে তাড়াতে। দাওয়ায়— বারান্দায়। রসুই ঘর— রান্নাঘর। জলচৌকি— কাঠের তৈরি ছোট চৌকি। যাওনের লাগি উখাল পাতাল লাগাইছে— যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নুয়ে পড়েছে— হেলে পড়েছে; নিচু হয়ে পড়েছে। ঘটি— কাঁসা বা সিলভারের তৈরি ছোট পানির পাত্র। টিনের প্যাটরা— টিন দিয়ে বানানো ছোট বাস্র। বেহান রাইতে— খুব সকালে। প্রকোপ— তীব্রতা; নির্বিকারভাবে— বিকারহীনভাবে; কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না এমনভাবে। পিচ্ছিল— পিচ্ছিল। নির্লিপ্ত— সমন্বয়হীন; সম্পর্কশূন্য। নিশ্চল— যা চলাচল করে না; স্থির।



সারসংক্ষেপ :

করিম শেখের নৌকায় করে মস্ত্র নানা জায়গায় যেতে শুরু করেছে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে মস্ত্র দেখে, মকবুলের ঘরের সামনে সবাই জটলা পাকিয়ে আছে। হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে। হীরনের বিয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেই সালেহা হঠাৎ মস্ত্রের বিয়ের কথা তোলে। নানা মেয়ের প্রস্তাব আসে; কিন্তু কোনোটাতেই সকলে সম্মত হয় না। শেষে আসে আশ্বিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা। আমেনাই প্রস্তাবটা দেয়। কিন্তু আশ্বিয়ার বংশে হাঁপানি আছে বলে মকবুল আপত্তি করে। হীরনের বিয়ের আলোচনা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখে মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলা ঝুলছে। টুনি আজ বাপের বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় মস্ত্রের জন্য সে রেখে গেছে স্মৃতিচিহ্ন। করিম শেখের বাড়ির দেউড়ির সামনেই আশ্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয় মস্ত্রের। আশ্বিয়া এই শীতের সকালেও পুকুর থেকে গোসল করে এসেছে। আশ্বিয়ার দেয়া পিঠা খেতে খেতেই মস্ত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে আশ্বিয়াকে বিয়ে করবে। এদিকে মকবুল আবার টুনিকে নিয়ে আসার জন্য মস্ত্রকে দায়িত্ব দেয়। টুনিদের বাড়িতে এসে মস্ত্র সবার সঙ্গে দেখা করে। সবাই কুশলাদি জানতে চায়। টুনি কিছুই জানতে চায় না, কেবল মুখ টিপে হাসে। মাঝরাতে টুনির ডাকে মস্ত্র ঘুম ভেঙে যায়। টুনি মস্ত্রকে ডেকে নিয়ে নিজেই খেজুর গাছে উঠে রস নামায়। সে নৌকায় বসে রসের সিল্লি রাঁধতে চায়। কিন্তু এতে মস্ত্র কঠোরভাবেই আপত্তি জানায়। রাগে, দুঃখে টুনি রসের কলসিটা মাটিতে ফেলে দেয়। পরদিন টুনি সারাদিন একবারও মস্ত্রের কাছে আসে না। রাতের বেলায় মাকে জানিয়ে দেয়, পরদিন সকালেই সে চলে যাবে। অথচ এর আগে টুনিই মস্ত্রকে কয়েকদিন বেড়িয়ে যেতে বলেছিল।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. ‘রসুনের মত সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ’ – কার?

ক. ফাতেমার

খ. আশ্বিয়ার

গ. টুনির

ঘ. পরির

১৮. করিম শেখের হাঁপানি শুনে মনোয়ার হাজির মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—

ক. আনন্দের সুর

খ. বিষাদের সুর

গ. তাচ্ছিল্যের সুর

ঘ. নিন্দার সুর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ফ্রাইডেতে ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফিরতে হবে। হোটেল থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে। কাউন্টারে যেতেই হোটেল বয় ধরিয়ে দিল একটি ফুলের তোড়া। জানতে পারলাম না, কে এসেছিল? তোড়ার নিচের দিকে দেখা গেল, বড় যত্ন করে লেখা একটি নাম— নাহরিন।

১৯. উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আশ্বিয়া

খ. টুনি

গ. সালেহা

ঘ. আমেনা

২০. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ –

i. ভালবাসা প্রকাশে

ii. ঘৃণা প্রকাশে

iii. হতাশা প্রকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii



পাঠ-৬



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মস্ত আর টুনির মধ্যকার মান-অভিমান কী করে সহজ হল তা বলতে পারবেন;
- মস্ত আর টুনির সার্কাস দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাড়ি পৌছাতে মস্ত আর টুনির এত দেরি হল কেন তা বলতে পারবেন।



মূলপাঠ

পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলো ওরা।

মস্ত আর টুনি।

ওর বাবা আর দুই চাচা শিকদার খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো ওদের। সঙ্গে ছোট দুই ভাইবোনও এলো আর এলো ওদের কালো কুকুরটা।

ছইয়ের মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিলো মস্ত। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসলো সে।

খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেলো ততক্ষণ সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টুনি।

তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইলো।

খাল পেরিয়ে যখন নৌকা নদীতে এসে পড়লো তখন দুপুর হয়ে আসছে।

টুনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। মস্ত সারাক্ষণ কথা বলার জন্যে আকুপাকু করছিলো। কিন্তু একবারও সুযোগ দিলো না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে এক সময়ে মস্ত বললো, বাইরে আইয়া বহো গায়ে বাতাস লাগবো।

ও নড়েচড়ে বসলো কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলো না।

একটু পরে একটা কাপড়ের পুটলি থেকে কিছু চিড়া আর এক টুকরো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো টুনি। বললো, বেলা আইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেলো সে।

মস্ত বললো, তুমি খাইবা না?

না।

না কেন?

ক্ষিধা নাই।

ঠিক আছে, আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগলো মস্ত। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেলো না।

ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বললো, খাইবা না।

না।

শেষে শরীর খারাপ করবো।

করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলো মস্ত।

আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারলো না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এলো সে, চিড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসলো।

নাও, খাও।

কইলাম তো খামু না।

তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখালো ওকে।

মস্ত নির্বিকার গলায় বললো, দাও ফালাইয়া।

কিন্তু ফেললো না টুনি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়লো কাঁধের ওপর।



টুনি বললো, আমি খাওয়াইয়া দিই।

মস্ত বললো, না।

টুনি বললো, তাইলে তুমি নিজ হাতে খাও। আমিও খাই। বলে এক মুঠো চিড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো সে।

মস্তর মুখেও এক বলক হাসি জেগে উঠলো। এতক্ষণে টুনির কোলের উপরে রাখা বাসন থেকে এক মুঠো চিড়ে নিয়ে সেও মুখে পুরলো।

টুনি বললো, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।

চিড়ে খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এলো টুনি।

এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি পৌছাইতে কতক্ষণ লাগবো?

মস্ত একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো, মাইজ রাতে।

বেশ জোরে দাঁড় বাইছিলো মস্ত।

হঠাৎ টুনি বললো, এত তাড়াতাড়ি করতাহ কেন? আস্তে বাও না।

মস্ত বললো, তাইলে বাড়ি যাইতে তিন দিন লাগবো।

লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে চরম নির্লিপ্ততা।

মস্ত কোনো জবাব দিলো না।

আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করলো ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দুহাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগলো। দুপাশে অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে রবি-শস্যের ক্ষেত, নারকেল আর ঘন সুপারির বন।

জেলেদের পাড়া।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে মাঝ নদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।

একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বললো, তুমি এইবার জিরাও। আমি দাঁড় টানি।

মস্ত হেসে বললো, পাগল নাকি?

টুনি বললো, ক্যান?

মস্ত বললো, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতার দরকার আছে।

টুনি আবার চুপ করে গেলো।

বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌছলো ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই শ্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকা নিয়ে এগোন যাবে না, কূলে এনে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাটা পড়লে তখন আবার নৌকা ছাড়বে মস্ত।

দূর থেকে শান্তির হাট দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ওইহানে কী?

মস্ত বললো, ওইটা শান্তির হাট।

টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গি করে বললো, ওইহানে চুড়ি পাওন যায়? আমাদের কিন্না দিবা?

মস্তর ইচ্ছে, জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকা ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বললো, হুঁ দিমু।

শান্তির হাটে পৌছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকা বাঁধলো মস্ত।

নদীর পাড়ে খালি জায়গাটায় তাবু পড়েছে একটা। বিচিত্র তার রঙ। বাইরে ব্যান্ড পার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি। সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, ওইহানে কী?

মস্ত বললো, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বললো, সেইটা আবার কী।

মস্ত বললো, নানারকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আর কত কী! বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলো টুনি। কিন্তু পরক্ষণেই বললো, আমরা দেহাইবা?

মস্তর কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়ে মানুষ নিয়া যাওয়াটা সমীচীন মনে হল না ওর। তাই বললো, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি। ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের বাইরে এলো টুনি।



বললো, ওমা, আমি একলা থাকবার পারমু না এহানে। তুমি যাইও না।
মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেলো মস্ত। ও নিজে এর আগে কোনোদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিলো এই সুযোগে একবার দেখে নেবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙে পড়লো সে। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তেই দেখলো শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়েছেলেও দলে দলে এসে ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে।
মস্তকী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, আহ, দেরি কইরো না, আহ।
ওর পিছু পিছু নিচে নেমে এলো টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে এক হাত লম্বা করে দিয়েছে। আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।
তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হাজারাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এক পাশে এক দল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।
তাঁবুর দরজার উপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সারা গায়ে মুখে নানারকমের রঙ মেখেছে ওরা। টুনি অবাক হয়ে বললো, ওমা সরম করে না।
মস্ত বললো, সরম করবে ক্যান, ওরা ম্যাইয়া লোক না, পুরুষ মানুষ মাইয়া সাজছে।
অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।
দরজায় দাঁড়ান লোকটার কাছ থেকে তিন আনা দামের দুখানা টিকেট কাটলো মস্ত। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর একটা কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়লো ওরা।
কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেলো।
প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির ওপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো।
দর্শকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠলো জোরে।
তারপর আসলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর ওপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগলো সে। সবাই একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলো।
এরপরে খুব জোরে ব্যান্ড বাজালো কিছুক্ষণ।
তার পরেই এলো বাঘ। এসেই একটা হুঙ্কার ছাড়লো সে।
টুনির দুচোখে অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশের দর্শকের দিকে তাকালো সে। তাকালো মস্তুর দিকে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো বাঘের ওপর।
সার্কাস শেষ হলো, দুজনের চমক ভাঙলো।
ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ঘাটে যাবার পথে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মস্তকে দেখে হাজি দোকান থেকে চিৎকার করে উঠলো, আরে মস্ত মিয়া কই যাও, শুন শুন।
মস্ত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, পারলো না।
আরে মিয়া কাজের কথা আছে শুইনা যাও। দুহাতে ওকে কাছে ডাকলো মনোয়ার হাজি।
টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো মস্ত। কাউন্টারে আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিলো।
হঠাৎ মনোয়ার হাজি শব্দ করে হেসে উঠে বললো, বাহরে বাহ বিবিজানের সঙ্গে নিয়া সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি?
সঙ্গে সঙ্গে আট জোড়া চোখ অদূরে দাঁড়ানো টুনির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো।
মস্ত কিছু বলবার আগেই, মনোয়ার হাজি সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, কহন করলা অঁ্যা? একবার খবর দিলা না। দাওয়াত করলা না, এইডা কেমন কথা?
হতবুদ্ধি মস্ত কী বলবে কিছু ভেবে পেলো না, সে শুধু ইতস্ততঃ করে একবার মনোয়ার হাজির দিকে আরেকবার টুনির দিকে তাকালো বার কয়েক। এক বিচিত্র অনুভূতির আবেশে মনটা ভরে উঠেছে ওর। মনোয়ার হাজি শুধালো, কোনো কাজ কাম নাইতো?
এক ঢোক গিলে মস্ত বললো, কিছু চুড়ি কিনন লাগবো।
হ্যাঁ, তা কিনবা না, নিশ্চয় কিনবা। একগাল হাসলো মনোয়ার হাজি। তারপর বললো, এহন চলো মিয়া ভাবীরে নিয়া আজকা রাতে আমাগো বাড়ি মেহমান আইবা।



মস্ত পরক্ষণে বাঁধা দিলো, না না তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরন লাগবো। ওর কথাটা কানে নিলো না মনোয়ার হাজী। সে জানালো, থাকার কোনো অসুবিধে হবে না ওদের। বাড়িতে ঘর আছে অনেকগুলো, তারই একটিতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেবে। তাতে যদি মস্তুর আপত্তি থাকে তাহলে, আরো একটা ভালো বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মনোয়ার হাজী। সার্কাস পার্টির ওখানে হোটেল উঠেছে কয়েকটা। এক একটা ঘর এক টাকায় এক রাতের জন্য ভাড়া দেয় ওরা। সেখানেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারে মস্ত। পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে মনোয়ার হাজী বললো, আরে মিয়া, নতুন বউ নিয়া যদি একটু ফুটি না কইরলা তাইলে চলে কেমন কইরা। এইতো বয়স তোমাগো।

এই শীতেও ঘেমে উঠেছে মস্ত। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।

ক্ষণকাল পরে মস্ত বললো, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আইজকা যাই।

ওর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো মনোয়ার হাজী। অবশেষে বললো, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকালো হাজী।

জোয়ার পড়ে যাওয়ায়, ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। যেখানে নৌকোটা বেঁধে রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মস্তুর ফতুয়াটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিচ্ছিলে পড়ে যাচ্ছিলো সে। মস্ত ধরে ফেললো। মাথার আঁচলটা কাঁধের উপরে গড়িয়ে পড়লো, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করলো টুনি। কাঁধের উপর থেকে ওর মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মস্ত সহসা অনুভব করলো, টুনির দুচোখ দিয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।

ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইলো মস্ত। মনটা আজ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলসিটা ভেঙে ফেললো টুনি, তখনও এত খারাপ লাগেনি ওর। আজ কেমন ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।

নৌকোর ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরলো মস্ত।

বন্ধুরে আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে।

তোমারে নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

ও পরাণের বন্ধুয়ারো।

নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

খালের মুখের কাছে নৌকো থামাতে হল।

ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকো নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মস্ত। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।

নৌকো থামাতে দেখে টুনি এতক্ষণে কথা বললো, কী, নাও থামাইলা ক্যান?

হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসলো মস্ত। বললো, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।

ক্যান? ক্যান? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো মস্ত। ওর হাসিটা কাটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনালো। নৌকো থেকে নোঙরটা নিয়ে নিচে নেমে গেলো মস্ত। ভালো করে মাটিতে পাতলো ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝ নদীতে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকায় উঠতে উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিলো মস্ত।

জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

এইহানে? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকালো টুনি।

আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথই পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। কয়েকটি জেলে নৌকো মাঝ নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জেলে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই-কুই।



পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোনো লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার উপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পূবে, ফেলে আসা নদী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।

উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরি লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেলো টুনি।

ও মাঝি। মাঝি- ও কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকলো, কোন হানের নাও, অ্যা?

গলায় চড়িয়ে মস্ত জবাব দিলো, পরির দীঘি।

জবাব শুনে চুপ করে গেলো জেলেটা।

এতক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিলো বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারেনি মস্ত। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকলো সে।

টুনি নড়েচড়ে এক পাশে সরে গেলো।

ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুকো আর কঙ্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিলো মস্ত। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগলো। দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।

আকাশে মেঘ।

মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার লুকাচ্ছে তাড়াতাড়ি।

টুনি ডাকলো, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।

মস্ত কোনো জবাব দিলো না। আপন মনে হুকো টানতে লাগলো সে।

টুনি আবার ডাকলো, আহ না, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবো।

মস্ত নীরব।

আইবা না? টুনির কণ্ঠে অভিমান।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুকোটা নিলো টুনি। চল, ভেতরে গিয়া শুইবা। এবার আর কোনো বাধা দিলো না।

নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়া শুয়ে পড়লো সে। ওর গায়ের উপর কাঁখাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইলো টুনি।

বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলো।

ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছলো ওরা।

মস্ত আর টুনি।

পরির দীঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।

দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠলো তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কে মরলো?

ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিলো কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মস্ত। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিলো ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারতো না। মরে বেঁচেছে বেচারি। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হতো।

দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিলো। প্রায়ই রক্তবমি করত। বুড়োরা বলত, শত্রুপক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।

তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো মস্তর।

হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ইতস্ততঃ করে মস্ত বললো, কান্দ ক্যান, কাইন্দা কী অইবে।

বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলো একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন।

দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান? অ্যা।

মস্ত খুলে বললো সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কী করতে পারে সে? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার ভাঁটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে



শান্ত হল। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ি উপরের ক্ষেতটার দিকে চলে গেলো, সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেলো মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অপলক— পলকহীনভাবে। অবসাদ— ক্লান্তি; দুর্বলতা। একছিলিম— এক টিপ। ছই— নৌকার ওপরে দেয়া অর্ধগোলাকার চাল বিশেষ। পুঁটুলি— বোঁচকা। মাইজ রাত— মধ্যরাতে শব্দটির আঞ্চলিক রূপ। জিরাও— বিশ্রাম নাও। ক্ষেমতো— ক্ষমতা বা শক্তি। দম ধরেছে— নিশ্চল বা শ্রোতহীন হয়ে পড়েছে। সমীচীন— উচিত। নিরাশ— আশাহীন। বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে— আশ্চর্য ও মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টিতে। হ্যাজাক— উজ্জ্বল আলোর বাতি। সরম— লজ্জা। বিকটাকার— অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট। চিরন্তন— চিরকালের বা চির দিনের। পাতা পানি— সামান্য পানি; পায়ের পাতা ডোবে এতোটুকু পরিমাণ পানি। জনবসতি— লোকজনের বসবাস। লোকালয়— জনপদ বা বসতি। বিস্তীর্ণ— দীর্ঘ। নিস্তব্ধ নিব্বুম— কোনো প্রকার সাড়াশব্দহীন। প্রান্তর— বড় মাঠ। পিলে— এক ধরনের রোগ; টিউমার। গভীর অসন্তোষ— খুব মনঃক্ষুণ্ণ; প্রবল বিরক্তি।



সারসংক্ষেপ :

পরদিন ভোরে মস্ত আর টুনি রওনা দিলো। শান্তির হাটে নৌকা রেখে তারা সার্কাস দেখতে গেলো। যদিও টুনিকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখতে মস্তর কেমন লজ্জা লাগছিলো। মস্তর এই লজ্জা শতগুণ বেড়ে যায় সার্কাস দেখে ফেরার সময় মনোয়ার হাজি টুনিকে যখন তার স্ত্রী বলে মনে করে। সে ঘাটে ফিরে এসে দেখে, ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। কাদার মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে মস্তর ফতুয়া ধরে টুনি এগোতে থাকে। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যেতে যেতে টুনি মস্তকে জাপটে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। আর মস্ত বুঝতে পারে টুনি নিঃশব্দে কাঁদছে। ভোরের দিকে গ্রামে পৌঁছল টুনি আর মস্ত। গ্রামে ঢুকেই পরির দীঘির পারে তিনটে নতুন কবর দেখলো তারা। তার মধ্যে একটা আবুলের বৌ হালিমার। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ করেই তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে সে। হালিমার মৃত্যু সংবাদ শুনে টুনি কাঁদল। বাড়ি ফিরে পড়লো মকবুলের অসন্তোষের মুখে। দুদিনের জায়গায় নবীনগর থেকে ফিরতে মস্তর চারদিন লেগেছে, এজন্য মকবুল বিরক্ত। পরে অবশ্য নদীর জোয়ার-ভাটা আর আত্মীয় বাড়ির অনুরোধের কথা শুনে মকবুল শান্ত হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. ‘বন্ধুরে আশা ছিল মনে মনে’ গানটি কে গেয়েছিল?

ক. করিম শেখ

খ. মনোয়ার হাজি

গ. সুরত আলী

ঘ. মস্ত মিয়া

২২. জোয়ারের সময় নৌকা চালানো যায় না যে কারণে—

ক. উজানে নৌকা বাওয়া কষ্টকর

খ. নদীতে বড় বড় ঢেউ থাকে

গ. উজানে নৌকা বাওয়া মাঝিদের ট্যাবু

ঘ. জলের চাপে নৌকা ডুবে যায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দিদি দুর্গার পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোওয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা হাতের পিঠে দুম করিয়া নির্খাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনোদিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো।

২৩. উদ্দীপকের দুর্গা ও অপু ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে?

ক. মস্ত ও টুনি

খ. মকবুল ও আমেনা

গ. আবুল ও হালিমা

ঘ. করিম শেখ ও আমিয়া

২৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ —

i. চপলতায়

ii. অভিমানে

iii. ঘৃণায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii



পাঠ-৭



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হীরনের বিয়ের সময়কার আনন্দঘন পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামে যে সব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান হয় তার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ওলাওঠা নিয়ে মকবুলের বাড়িতে সৃষ্ট আতঙ্কের বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এলো।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোনো কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আট টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।

মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এলো আমেনা। বরপক্ষের লোক মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়তো বদনাম করবে ওরা, তাই।

বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে-শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার উপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মস্ত সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভুঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।

আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।

পুরো উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে ওরা।

টুনি পুকুর ঘাটে বাসনপত্রগুলো মাজছে।

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাধ হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার। দুপুর রাতে পাড়াপড়শীরা অনেকে এলো। কাচাবাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে, উঠোনে বসলো ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে করে গান ধরলো—

মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।

আমরা লাগী দুলহা কইন্যার সাজে।

টেকির উপরে তখন আশিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধ্যা থেকে টেকির উপরে উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিলো। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আশিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরলো।

ভাঁটুইরে না দিয়ো কলা

ভাঁটুইর হইবে লম্বা গলা।

সর্ব লইক্ষণ কাম চিকন পঞ্চ রঙের ভাঁটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোরে হুকো টানছে আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।

হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।

সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিস্তি ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো সালেহা।

মকবুল বললো, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো। আঁচল দুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।



আবের পাঙ্ক্ষা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।

ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আশিয়াও বাইরে বেরিয়ে এলো।

আশিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এলো ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ করে ফকিরের মা গান গাইলো।

কেমন তোমার মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।

এত বড় মাইয়া অইছ না করাইছে বিয়া।

ওর গানটা শেষ না হতেই আশিয়া নেচে উঠে গানের সুরে জবাব দিলো।

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।

তোমার মতো কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া।

দূর পোড়া কপাইলা, দূর দূর করে তাকে তাড়া করলো ফকিরের মা।

দৌড়ে গিয়ে মস্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিলো আশিয়া। সালেহা হেসে বললো, কিরে আশিয়া, এত ঘর থাকতে শেষে আমাগো মস্তুর মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।

মস্তুর তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানী তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বললো, কী মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।

মস্তুর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সবাই।

তীব্র গলায় সে বললো, কী অইতাছে অ্যাঁ? কী অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কী শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ?

সহসা সবাই চুপ করে গেলো। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।

মস্তুর নির্বাক।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আশিয়া। তার চোখমুখ পাকা লক্ষার মতো লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম বরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলো। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড় বিড় করে বললো, এমন কী কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু? সালেহা বললো, আমরা না অয় মস্তুর মিয়া আর আশিয়ারে নিয়া একটু খানি ঠাট্টা মস্করা কইরতাইলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে বড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। কী কইলা অ্যাঁ, কী কইলা অ্যাঁ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বললো, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচালো সে।

পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সালেহা। মনে হল এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে।

মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠলো, কিরে কী অইলো অ্যাঁ। কী অইলো।

রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এলো সেখানে।

রশীদ বললে, কী কান্দবি না কইবি কিছু, কী অইছে? সালেহা কোনো জবাব দিলো না।

ফকিরের মা বুঝিয়ে বললো সব।

সালেহার কোনো দোষ নেই। আশিয়া আর মস্তুরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিলো ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।

মাইরছে। মাইরছে ক্যান? রশীদ ক্ষেপে উঠলো।

ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিলো সালেহা।



বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, মস্ত আর আশিয়া কই গেছে? মস্তকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু আশিয়াকে পাওয়া গেলো না সেখানে। এই গন্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।

ফকিরের মা বললো, ওগো কোনো দোষ নাই।

কী ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। আস্তে করে বললো, তোমরা হৈ-চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এইসব ভালা না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেলো সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বললো, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও। ছেলে-বুড়োরা আবার হৈচৈ করে উঠলো।

ফকিরের মা আবার গান ধরলো।

এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেলো আমেনা। বললো, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এলো আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো।

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।

এত বড় ডাঙ্গর অইছ না করাইছে বিয়া।

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে বে বে করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে উঠেছে ওর।

ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমালো না।

তারপর একজন দুজন করে যে যার ঘরে চলে যেতে লাগলো। মস্ত সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিলো টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকলো সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।

বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বললো, দেহি তোমার হাত দেহি।

মস্ত বললো, ক্যান?

টুনি বললো, তোমারে মেহেদি দিমু।

মস্ত বললো, না।

টুনি বললো, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিলো সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগলো টুনি। মস্ত কোনো বাধা দিলো না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসল। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?

কী?

একডা বিয়া কর।

হুঁ।

দুজনে আবার চুপ করে গেলো ওরা।

ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বললো, আরেকডা কথা রাইখবা?

কী?

আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।

হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মস্ত। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, কথা দিলো? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকালো টুনি। মস্ত কী বলবে ভেবে পেল না। বার কয়েক ঢোক গিলল সে।

তারপর হঠাৎ করে বললো, শাপলা তুলতে যাইবা?

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো টুনি। না।

তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।

টুনি আরো জোরে মাথা নাড়লো, না।

না ক্যান? মস্তর কণ্ঠে ধমকের সুর।

টুনি হেসে বললো, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে ওঠে দাঁড়ালো সে। মস্তকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেলো টুনি।



বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হল। ছেলে-বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মস্ত।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায় বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মস্তরও শরীরটা ভালো নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইস। তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি কেউ, তাই।

মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ে না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।

আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই।

একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দুবার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনার কী অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনি।

কথাটা কানে নেয়নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মস্তকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ঔষধ নিয়ে আসার জন্য।

উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে দিলো মস্ত। বললো, কোবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমতো খাইতে।

টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, কী অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকালো টুনি, কেউ শুনলো নাকি দেখলো। মস্ত কোনো জবাব দিলো না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুকো আর কঙ্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেলো সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মস্তর সামনে বসলো টুনি।

অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃষ্ণার সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধালো, খাইবা?

বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মস্ত বললো, না। তারপর একমনে হুকো টানতে লাগলো সে।

টুনি বললো, কোবিরাজ কী কইছে?

একরাশ ধুঁয়া ছেড়ে মস্ত জবাব দিল, কইছে, কিছু না, ভালো অইয়া যাইবো।

ভালো অইয়া যাইবো? চোখজোড়া কপালে তুললো টুনি।

নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারল টুনি।

সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনোহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।

পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো কুকুরটা।

চৈত্র মাসের রোদে পুরো মাঠটা খা খা করছে।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে।

নদী-নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমতো পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোতে পানিও অনেক কমে আসে।

গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগীর ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে তাই। পথে বামুন বাড়ির হাট থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।

ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এলো মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো সুরত! সুরত! ও মস্ত, কেউ কি নাই নাকি রে।



মস্ত গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।

আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ভাই সাব, কী অইছে?

টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এলো বাইরে।

মকবুল বললো, সুরত, রশীদ ওরা কই?

আমেনা বললো, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।

ওর জ্বর হইছে ভীষণ।

জ্বর নাই, আহা কখন আইলো? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বললো, বাপু তোমরা সন্ধলে একটু সাবধানে থাকো! ও বিস্তির মা, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাকো।

গেরামে ওলা বিবি আইছে।

ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও! আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠলো।

গনু মোল্লা ওজু করছিলো, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি? কোন্‌ বাড়িতে আইছে?

মকবুল বললো মাঝি-বাড়ি।

মাঝি-বাড়ি? একসঙ্গে বলে উঠলো সবাই। কয়জন পড়ছে?

তিনজন।

তিনজন কে কে সে কথা বলতে পারবে না মকবুল। পথে আসার সময় ও-বাড়ির আশ্রিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে। বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্ত সাবধান করে দিলো বুড়ো মকবুল, তোমরা সন্ধলে একটু সাবধানে থাকো বাপু। একটু দোয়া দরদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেলো সে।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনছিলো সব, এবার বিড়বিড় করে বললো বড় খারাপ দিনকাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডার একেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করলো সে।

টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এলো ওর দিকে, বুড়ি যখন তখন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্গির থাম।

ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেলো। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।

ইতোমধ্যে মস্ত আর সুরত ফিরে এসেছে।

কাঁধের উপর থেকে কুড়োলটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেলো ওকে।

মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো?

মস্ত ঘাড় নাড়লো, না ক্যান কি অইছে?

টুনি বললো, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেলো ওর।

মস্তর দুচোখে বিস্ময়। বললো কার কাছ থাকি শুনছ?

ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বললো, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। যাইও না কিন্তু?

মস্ত সায়ে দিয়ে মাথা নাড়লো কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলো না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মস্ত। নৌকোটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনেনি সে।

আশ্রিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিলো, সেও কিছু বলেনি।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবলো মস্ত। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেয়ার জন্যে সেই ঘরে গেছে টুনি।

এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লো সে।

দীঘির পাড়ে মস্ত শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মস্তকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করলো, কী মিয়া খবর সব ভালো তো? মস্ত নীরবে ঘাড় নাড়লো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কই যাও শ্বশুরবাড়ি বুঝি?

হুঁ, তোরাব শ্বশুর বাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারেনি, খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।



পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের করে একটা মস্তকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরালো সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছা করছিলো না ওর। তবু নিতে হল। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামলো তোরাব। জুতোজোড়া বগল থেকে নামিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেলো সে।

বললো, একটুখানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরানি।

হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার উপরে উঠে এলো তোরাব।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বললো, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাই সকলে ভালো আছে তো?

মস্ত বললো, ভালো তো আছিলো, কিন্তু একটু আগে শুনিছি, ওলা লাগছে।

ওলা? তোরাব যেন আঁতকে উঠলো। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধালো, কার কার লাগছে?

মস্ত বললো, কী জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হঁ। হঠাৎ থেমে গেলো তোরাব। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বললো, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোনো মানি অয় না মিয়া, যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালো সে। আস্তে করে বললো, আমি যে আইছলাম এই কথাটা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মস্তর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিলো সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চললো তোরাব। হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মস্ত।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আব- পানি। কার্পণ্য- কৃপণতা। কুর্তা- ছেলেদের ছোট জামা। কেলেকারি বাধাইবো- সকলে বদনাম করবে। ঘনিয়ে এল- কাছাকাছি এসে পড়ল। পেয়ালা- বাটি। বরতন- থালা। গড়- বড় মাঠ। খিল দিল- কপাট বন্ধ করল। চিবুক- কপোল। পাকা লঙ্কা- লাল মরিচ। পরক্ষণে- পর মুহূর্তে। ঠাট্টা মস্করা- হাসি ঠাট্টা। ঘটনার আকস্মিকতা- হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ঘোর। জনশূন্য- লোকজন নেই এমন। দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি- ঘুমুতে পারেনি। মরাকান্না- রাড়িতে কেউ মারা গেলে লোকেরা যেমন কাঁদে তেমন কান্না। ফাঁল-চির; ছিদ্র। মাথা খাও- শপথ বিশেষ; মাথার দিব্যি। সাত-পাঁচ- বিবিধ; নানা রকম। প্রসন্ন- সন্তুষ্ট; নির্মল। হ্যাঁচকা টানে- সজোরে টান দেয়া।



সারসংক্ষেপ :

হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে বাড়িতে সাজসাজ রব পড়ে গেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে; মকবুল তাই কোনো কৃপণতা করেনি। আয়োজনের কোনো কমতি রাখেনি। মেহেদির আসরে হঠাৎই বৃদ্ধা ফকিরের মাকে নাচতে দেখে সবাই খুব আনন্দিত হল। এমন সময় সেখানে আশিয়া আসায় তাকেও ফকিরের মা আসরের মাঝখানে টেনে নিয়ে নাচতে লাগলো। লজ্জা পেয়ে আশিয়া ফকিরের মার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে মস্তর ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিলো। টুনি ক্ষেপে গিয়ে সালেহার চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিয়ে কিল ঘুষি মেরে সেখান থেকে চলে যায়। টুনির এই অদ্ভুত আচরণে বাড়ির সবাই অবাক হয়ে যায়। মকবুল টুনির এই আচরণের যথাযথ শাস্তির বিধান করবে এই আশ্বাস দিলে আবার সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। ভোরের দিকে মস্ত যখন ঘুমুতে যাচ্ছিল তখন টুনি আসে তার কাছে। মস্তর হাতে মেহেদি পরিয়ে দেয়। তাকে একটা বিয়ে করতে অনুরোধ করে। সঙ্গে একথাও বলে যেন মস্ত টুনির পছন্দে বিয়ে করে। মস্ত টুনির কথায় সায়া দেয়। টুনিকে শাপলা তুলতে যেতে বলে, মাছ ধরতে যেতে বলে। কিন্তু টুনি কোথাও যেতে রাজি হয় না। এদিকে চৈত্র মাস এসে গেলো। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। এমনি একদিন মকবুল নতুন বেয়াই বাড়িতে বেড়াতে গেলো। ভর সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে এলো একটা আতঙ্কের খবর সঙ্গে নিয়ে। ওলাবিবি আক্রমণ করেছে। ওলাওঠার সংবাদে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. বিয়াই বাড়িতে মকবুল কি নিয়ে গিয়েছিল?

ক. কলা

গ. ডিম

খ. দুধ

ঘ. আলু



২৬. টুনির অসংযত আচরণ বুড়ো মকবুল যেভাবে সামাল দিয়েছিল—

ক. টুনির দোষ অস্বীকার করে

খ. টুনির দোষ স্বীকার করে

গ. টুনির বিচারের আশ্বাস দিয়ে

ঘ. টুনিকে শাসন করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

২৭. উদ্দীপকের রামসুন্দর ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. সুরত আলী

খ. বুড়ো মকবুল

গ. কদম শেখ

ঘ. গনু মোল্লা

২৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ—

i. ধর্মীয় বিধিনিষেধ

ii. ঋণমুক্ত হওয়া

iii. সন্তান বাৎসল্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

পাঠ-৮



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- ওলা ওঠা রোগে সমস্ত গ্রাম কীভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো তা বলতে পারবেন;
- ওলা বিবিকে নিয়ে প্রচলিত একটি লৌকিক উপাখ্যান বিবৃত করতে পারবেন;
- মকবুল কেন আশ্বিয়াকে বিয়ে করতে চাইলো তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

মাঝি-বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এলো সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেলো। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো মস্তুর। মাঝির বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর। নস্তু শেখ মারা গেলো। হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আশ্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলো মস্তুর।

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আত্ননাদ করে উঠলো। এই কী মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো মস্তুর। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোট ভাই জমির শেখ কোবিরাজ আনতে গেছে দুক্ৰোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসেনি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা নাই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দুগুণ বেয়ে পানি বরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এলো ওর। আশ্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখলো, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্টা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মস্তুর।



পরিষদ দীঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে ছমির শেখ। কথা ছিলো একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটো খুঁড়তে হবে। একটা নম্র শেখের জন্যে আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কোবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নম্র শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায়ই একটা গান গাইতো নম্র শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেলো মম্বর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।

মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নম্র শেখ। বলতো, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁড়িলাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যখন, একদিন সাত আটটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্থানে কার কোনটা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে, সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নম্র। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিংবা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সাবইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলতো, চিনবার পার এরে? না না তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি, এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি। এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিলো বটে একটি। যেনো টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাতো নম্র শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে দেখতো ওটা, আহা কী মাইয়া কী অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এখন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নম্র আবার বলতো, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিলো অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা এ পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নম্র বলে যেতো, সেই বহুত দিনের কথা মিয়া, তখন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিল। সেই নম্র শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এলো মম্বর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মম্বর। দীঘির পাড়ে কাটিয়ে দিলো সে। ওর মায়ের কবরটা দেখলো। এককালে বেশ উঁচু ছিলো ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দুএকখানা হাড় হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল ওর। মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকালো মম্বর। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মম্বকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বললো, ঘরে যাইবা চল। কোনো কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়ালো মম্বর। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরলো না সে।

বললো, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, কই যাইবা?

মম্ব বললো, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরিষদ দীঘির পাড় থেকে নেমে এলো সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মম্বর শুনতে পেলো গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কী যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনোদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বললো, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যখন তখন আহে।

আমেনা বললো, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এত বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লাহ মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করলো, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেলো আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষা বিবি ওরা ছিলো তিন বোন। তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেতো একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরতো না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। রঙ্গীন শাড়ি পরে বেরলো কী হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন এরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক



কাণ্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেলো ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত।

হঠাৎ মস্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেলো। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই নাই, মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ?

গনু মোল্লা বললো, আক্কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বললো, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার সে বললো, বাপু গেলেই কী অইবো আর না গেলেই কী অইবো। যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারবো না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন জানালো টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানালো, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বললো, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকালো সে।

মকবুল জানালো, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিলো। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলোতে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।

সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। হ্যাঁ তাই করবে।

রাতে ঘুম হল না মস্তুর।

সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করলো সে। না, একটা বিয়ে ওকে এবার করতেই হবে। এমনি একা জীবন আর কতদিন কাটাবে মস্ত। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানিং টুনি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে।

গ্রামেত কত লোক তাদের বউকে তালুক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালুক দেয় না টুনিকে? হঠাৎ পরিবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো মস্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।

ঘর নাই বাড়ি নাই দেখিতে জবর।

পরিবানুর আসিক লইল তাহারি উপর।

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্তের বউ পরিবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হতো না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। ঘর ছেড়ে পুকুর পারে গিয়ে নীরবে বসে থাকতো সে। আর সেখান থেকে দেখতো একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাতো সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেলো।

তারপর।

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।

দুইজনে পালায়া গেলো চোখে ধূলা দিয়া।

মস্তুরও তাই মনে হল। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোন গ্রামে কিম্বা শহরে। না। শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তা হলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মস্ত। যে-কোনো দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবে সে। এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মস্ত।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরতেই আমেনা জিজ্ঞেস করলো, নস্ত শেখের বাড়ির কোনো খবর জান?

না।

ওমা জান না? নস্ত শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।

মস্ত কোনো কথা বললো না।



আমেনা বলে চললো, কবিরাজে কিছু কইরবার পারলো না। তাই ও গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।

মস্তকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেলো।

অবশেষে আরও আট দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক পরে বৃষ্টি এলো জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এলো অবিরাম বর্ষণ।

সারা রাত মেঘ গর্জন করলো। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হল।

আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিকে নিবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালির পয়সাটাও জুটতে হবে তাকে।

ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়লো মাঠে।

আবুল, মস্ত, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।

পুরুষেরা কেউ বাড়ি নাই।

পুরো মাঠ জুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মতো শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।

হট হট হট, হুঁ উ উ।

বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মস্ত আর সুরত।

এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলতো তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকতো মাটিতে।

নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিতো সুরত। মই দিতো। ধান ফেলতো খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করতো।

ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।

আহা জমিডার কী অবস্থা কইরাছে দেখছস? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বললো, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।

মস্ত সঙ্গে সঙ্গে বললো, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।

কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ।

বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো সুরত আলীর। রুগ্ন গরু দুইটাকে হট, হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বললো, জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলো মস্ত মিয়া, জমির খেদমতো করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।

শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনোখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিতো সে। তখন সাত মণের জায়গায় আট মণ ধান বের করতো সে এ জমি থেকে।

আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিলো খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মস্ত মিয়া? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মস্ত মিয়া? হিরর। হট। হট। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিলো সুরত আলী।

অদূরে রশীদ তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ খুবড়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার ক্ষেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের ক্ষেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কী ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।

মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিলো, কী কও না।



ধান তো ফালাইয়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।

দাও, দাও ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।

আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিলো। ধান বেশি অইলেই-বা কি বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগব।

ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ। মকবুল সাত্তনা দিলো ওকে।

সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে কোনো আরাম নাই মস্ত্র মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কী অইলো। হালার নবাবের ব্যাটা। হট, হট, হুঁ উ উ।

মস্ত্র ততক্ষণে গান ধরেছে।

আশা ছিলো মনে মনে, প্রেম করিমু তোমার সনে

তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিলো মস্ত্র।

ইতি, ইতি, ইতি, চল।

সুরত বললো, গান থামাইলি ক্যান মস্ত্র। গাইয়া যা গাইয়া যা।

মস্ত্র বললো, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।

হ, হ দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মস্ত্র মিয়া। তোর গলা হুকাই নাই।

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুটি কইরছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মস্ত্র মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিল সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।

ও খোদা,

আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন রোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশলো সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসলো সে। বললো, মস্ত্র মিয়া আহ, তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে উঠে এলো। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুকোটো বাড়িয়ে দিলো সুরত। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, মস্ত্র মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ। সইন্ক্যা বেলা বাড়ি থাইকো। রশীদ আর সুরত একবার হুকোর দিকে তাকালো। কিছু বললো না। ওদের নজর এখন হুকোর দিকে।

সন্ধ্যে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনলো মস্ত্র। ওর বিয়ের কথা।

মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দিবে মস্ত্রকে। চাচা-চাচি এতদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।

চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আশিয়া।

মস্ত্র শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর আশিয়া একা। বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট ক্ষেতটা আর সে নৌকোটার এখন মালিক সে।

ওকে বিয়ে করলে মস্ত্র অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।

রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিলো।

তাকে ডাকলো মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়াছে।

ওপর থেকে রশীদ বললো, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সন্ধলের হাঁপানি অইবো।



মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বললো, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্ত্ৰ সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আশ্বিনাকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলতো তাহলে তক্ষুণি রাজি হয়ে যেতো সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্ত্ৰ।

বুড়ো মকবুল বললো, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্ত্ৰ। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।

ফকিরের মা বললো, আপনারা মুরব্বি, আপনারা ঠিক কইরা ফালান।

আমেনা বললো, ঠিক কথা কইছ চাচি।

মন্ত্ৰ তখনও ভাবছে।

একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো ক্ষেত। দেখতেও সুন্দরী সে।

বুড়ো মকবুল বললো, তাইলে ওই কথাই রইলো। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।

মন্ত্ৰ চুপ করে রইল, তারপর খুব আস্তে করে বললো ও আপনারা যেইডা ভাল মনে করেন, করেন।

মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে। মন্ত্ৰর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। বললো, আমাগো মন্ত্ৰ মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখানা পালকি আনন লাগবো।

ফকিরের মা বললো, মাইয়া এমন কইরা হাসতাহে য্যান ওর বিয়ার কথা অইতাহে, দেহ না কারবার।

ওর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে পরমুহূর্তে সেখান থেকে সরে গেলো টুনি।

বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বললো, ভালো অইছে। মন্ত্ৰ এইবার সংসারি অইবো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।

মকবুল রেগে উঠল। এই রাতেরবেলা এখন ঘুমোতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কী কথা বলতে চায় টুনি। রেগে বললো, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।

টুনি বললো, না অহনি লাগব।

বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, আচ্ছা কও কী কথা।

চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বললো টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা ক্ষেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আশ্বিনাকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবেনি এর আগে। টুনি যা বললো, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আশ্বিনাকে বিয়ে করায়।

সারাদিন একটানো ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, চিন্তা কইরতাছ কী, চিন্তা করার কিছুই নাই।

এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল মকবুলের। মনে হল টুনির কাছে নেহায়েত একটা শিশু সে।

একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বললো, বড় বউ আর মাইবা বউ যদি রাজি না হয়?

টুনি বললো, রাজি অইবো না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।

মকবুল বললো, ওগো না অয় রাজি করন গেলো। কিন্তু আশ্বিয়া?

মকবুলের কর্ণস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।

টুনি বললো, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইব না ক্যান?

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওরা। মকবুল বললো, বহ বউ। বহ।

টুনি বসলো ওর পাশে। দুজনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইলো ওরা। বাড়ির কাচাবাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিছা বলছে ফকিরের মা। সওদাগরের কিছা। একমনে হা করে শুনেছে সবাই।

সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বললো বুড়ো মকবুল।



শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, এমন কী অভাব আছে আপনার যে ওকে বিয়ে করতে চান।

ফাতেমা বললো, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি?

টুনি বললো, মাইনষের কথা ছইনা কী অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানালো। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হল না।

অবশেষে মকবুল রেগে গেলো, শাসিয়ে বললো, অত কথা বুঝি না। আশ্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অষ্ট প্রহর— আট প্রহর; দিনরাত সারাক্ষণ। অবিরাম বর্ষণ— একটানা বৃষ্টি। অস্থি— হাড়। আল্লা মালুম— আল্লাহ জানেন। কিচ্ছা— গল্প; অধিকাংশই রূপকথা বিষয়ক। খপ কইরা— হঠাৎ করে। খেদমত— সেবা; যত্ন; পরিচর্যা। বিলাপ— আক্ষেপপূর্ণ কথা। জর্জর— জীর্ণ; অত্যন্ত রুগ্ন। দুক্রোশ— চার মাইলের কিছু বেশি; এক ক্রোশ = ৮০০০ হাতের সমান অর্থাৎ দুই মাইলের কিছু বেশি। বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না— বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। ভেদবমি— বিরামহীন বমি। বনিবনা— সড়াব; মনের মিল। বার বাড়ি— বাড়ির বাইরের দিকের অংশ। গ্রামান্তরে— অন্য গ্রামে; একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। ঠিকে নিবে— ধার নেবে। সরেস— শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। জমিন— জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। ইনছাফ— ন্যায় বিচার। ধান তো ফালায়া দিলা— ধান মাটিতে বুনে দিলাম এ অর্থে। সান্ধনা— আশ্বাস দিয়ে শান্ত করা; প্রবোধ। গাজী কালু; সোনাভান— পুঁথি সাহিত্যের বিখ্যাত সব চরিত্র। ফয়সালা— মীমাংসা; মিটিয়ে ফেলা। চোখ পইড়াছে— অনেকের নজর পড়েছে। সম্বন্ধ— বিয়ের প্রস্তাব অর্থে এখানে ব্যবহৃত। নেহায়েত— সামান্য। গভীর অন্তরঙ্গতা— খুব অন্তরঙ্গভাবে। প্রতিবাদ— আপত্তি। শাসানো— ভয় দেখানো।



সারসংক্ষেপ :

ওলা বিবির আক্রমণে কে কখন মারা যাবে তার কোনো ঠিক নেই। মাঝি বাড়ির নম্ব শেখ মারা গেলো। ওলা বিবি সম্পর্কে গ্রামের লোকদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে তার একটা পা খোঁড়া। সে মানুষ, কুকুর বা বেড়ালের চেহারা নিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়। সে জন্য মকবুল বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে দিলো যাতে তারা পা খোঁড়া কাউকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে না দেয়। সেদিন রাতে মস্তুর ভালো ঘুম হল না। বারবার পরিবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো। আর ভাবলো টুনিকে নিয়ে যদি ঐ পুঁথির রাখাল ছেলের মতো দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারতো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খবর পেল, মাঝি বাড়ির করিম শেখও মারা গিয়েছে। অবশেষে আরো দশ দশটি প্রাণ হরণ করে তবে ওলা বিবি বিদায় হল গ্রাম থেকে। গ্রামের সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মসজিদে সিন্ধি পাঠালো। মিলাদ দিলো প্রত্যেক বাড়িতে। মস্তুর সঙ্গে আশ্বিয়ার বিয়ের প্রস্তাব দেয় মকবুল। টুনি কৌশলে মকবুলকে বোঝায়, মকবুল যদি নিজেই আশ্বিয়াকে বিয়ে করে, তবে মস্তুর বদলে সম্পদের মালিক মকবুলও হতে পারে। মকবুল ঘোষণা করে, আশ্বিয়াকে সে নিজেই বিয়ে করবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. আশ্বিয়ার সম্পদ ছিল কী কী?

ক. জমি, নৌকা, বাড়ি

গ. শেয়ার, পুট, জমি

খ. ফ্ল্যাট, লঞ্চ, পুট

ঘ. টাকা, জমি, লাঙ্গল

৩০. ওলাওঠার সংবাদ শুনে তোরাব পালিয়ে গেল যে কারণে—

ক. শ্বশুর বাড়িতে সকলে অসুস্থ বলে

গ. মাঝি অর্থ চাইতে পারে মনে করে

খ. ওলাওঠায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে

ঘ. শ্বশুরের রাগের কারণে



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত, শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

৩১. উদ্দীপকের কাঙালী ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. নম্ব শেখ খ. মন্তু মিয়া গ. কদম শেখ ঘ. ইদন মিয়া

৩২. উদ্দীপকটির ভাবার্থ নিচের যে বাক্যে বিদ্যমান—

ক. তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেল আমেনা।

খ. সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করল সে।

গ. রাতে ঘুম হল না মন্তুর।

ঘ. মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নই।

পাঠ-৯



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- কোন পরিপ্রেক্ষিতে মকবুল তার দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- অসুস্থ মকবুলের প্রতি টুনির সেবাপরায়ণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মন্তু ও আশ্বিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

কথাটা চাপা থাকলো না।

পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেলো ব্যাপারটা।

মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।

কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।

মন্তু রীতিমতো অবাক হল।

সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললো, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে ছনলে কইবো কী?

ফকিরের মা বললো, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়ার, এইডা উচিত অয় নাই।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসা-হাসি কইরবো। আপনে উনারে বাধা দেন। আপনার কথা ওনি ছনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করলো গনু মোল্লা।

বললো, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইবো।

শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজনে ক্ষেপে উঠলো। এইসব কী অ্যাঁ, বুড়ার কী ভীমরতি অইছে নাহি?

আবুল বললো, বুড়ো বয়সে এইসব কী পাগলামি শুরু অইছে।

কিছু বললো না শুধু মন্তু।

রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হল সবাই।

রশীদ এলো। আবুল এলো। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এলো।

এলো না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।

মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইলো।

সব কিছু সেও শুনেছে।

গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।

এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগলো বুড়ো মকবুল। টুনি বললো, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।

টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আশ্বিয়াকে বিয়ে করুক।



বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিলো টুনি। বললো, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখন লাগে।

গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করলো না। আবুল বললো, সুরতকে যেতে।

সুরত বললো, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না। অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হল।

উঠোন থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে। মকবুল বেরলো না। বেরিয়ে এলো টুনি।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বললো, আপনারে যাইতে কয়, গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বললো, ক্যান, ক্যান, যাইতে কয়।

টুনি বললো, কী কথা আছে।

মকবুল বললো, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান? টুনি ওকে শান্ত করলো। বললো, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কী কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলো সবাই।

কারো মুখে কথা নেই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার ওপরে বসলো। সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কী দিয়ে যে গুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বললো, কই আপনারা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসলো।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বললো, মস্তুর বিয়ার ব্যাপারে কী অইছে। কথাটা বলে, মকবুলের দিকে তাকালো সে।

বুড়ো মকবুল কোনো জবাব দেবার আগেই টুনি বললো, মস্ত কইছে ও আম্মিয়াকে বিয়া করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পর মুখের দিকে তাকালো সবাই।

ফকিরের মা বললো, কই মস্ত মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মস্তকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেলো না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বললো, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্মিয়ারে। আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠলো, হু তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকালো।

টুনি বললো, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠলো, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কী?

চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠলো মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, সরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বললো, আম্মিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকালো সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, আপনারা শুনছেন, শুনছেন আপনারা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।



যা কইছি ঠিক কইছি। আঙ্গুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসালো মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।

শুনছেন শুনছেন আপনেরা। কী কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেললো। গনু মোল্লা বললো, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোনো কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কী কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বললো, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বললো, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকালো মকবুল।

ফাতেমা বললো, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।

নিমকহারাম বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে একসঙ্গে তালুক দিয়ে দিলো সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠলো।

পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আমেনা।

ফাতেমা মূর্ছা গেলো।

ফকিরের মা চিৎকার করে উঠলো, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কী কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কী কইরলি।

আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো মকবুলের কপাল লক্ষ করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অঁয়া। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআকেইল্যা কোনহানের।

দুহাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিলো।

মকবুলকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো টুনি।

ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলো সালেহা।

ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেললো।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলো মস্ত। সব দেখলো সে।

কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। নীরবে পরির দীঘির দিকে চলে গেলো সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেলো ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেলো ওরা। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়ার মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেলো, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে, মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইলো, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।

ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিলো ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভালো ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দুএকবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলো। এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এলো ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কিনা দেখলো। তারপর আস্তে করে বললো, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালো অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরে বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালুক দিলে তো আর তালুক অয় না। ওই তালুক অয় নাই তোমার।

এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেলো।

টুনির ওপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বললো। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা।



টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিলো না।

দিন কয়েক পরে আশ্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেলো, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আশ্বিয়া। তাছাড়া খুব শীঘ্রই আশ্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাটা শুনলো বুড়ো মকবুল। শুনে কোনো ভাবান্তর হল না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ইদানিং দিনরাত মকবুলের সেবা শুশ্রূষা করছে টুনি। সারাক্ষণ সে ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচ ক্ষেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মস্ত্র আর আশ্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আশ্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মস্ত্র। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মস্ত্র যখন বাইরে বেরবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়ালো টুনি। বললো, জ্বরটা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কোবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা? ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মস্ত্র। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মস্ত্র ইতস্তত করছিলো।

টুনি আবার বললো, আজকা না হয় মাঝি-বাড়ি না গেলো। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো স্নান হাসি।

মস্ত্র কী জবাব দেবে ভেবে পেলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, যাইবা না ক্যান, একশ বার যাইবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়ালো না টুনি। পরক্ষণে চলে গেলো সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মস্ত্র। তারপর বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো মস্ত্র। বর্ষা এগিয়ে আসছে।

আশ্বিয়া বলেছে, নৌকোটা ঠিক করে নেবার জন্যে। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিলো নৌকোটা নিজে বাইবে।

কিন্তু আশ্বিয়া রাজি হয়নি। মস্ত্র ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মস্ত্র সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশি। কিন্তুক ভালো অইতাছে না আশ্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আশ্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মস্ত্রের কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম। তবু বারবার মস্ত্রকে বাড়িতে ডেকেছে আশ্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মস্ত্রের জন্যে অপেক্ষা করছিলো আশ্বিয়া।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিলো আশ্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না। আশ্বিয়া বললো, এত দেরি অইলো?

মস্ত্র বললো, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিলো তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আশ্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কী যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মস্ত্র।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বাইরে তখন ইলশেঙ্গড়ি পড়ছে।

ক'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাত্তার ওপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিলো এদিকে সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দুভাই মাছ ধরছিলো বসে বসে।



মস্তকে দেখে বললো, কী মিয়া এত রাইতে কোন্ দিক থাইক্যা?

মাঝি-বাড়ি।

হঁ। একটা পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বললো, চইল্যা যাও ক্যান মস্ত মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরটা ভালো নাই।

মস্ত যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে ছকু বললো, আরে মিয়া যাইবা আর কি বও। কথা আছে।

কী কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর করে মাটিতে বসলো মস্ত।

নিবুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বললো, কী মস্ত মিয়া তুমি নাই করিমনের বইন আশ্বিয়ারে বিয়া কইরতাহ হনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল সে। তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকালো মস্ত। কিছু বললো না।

মকু বললো, ভালো মাইয়ার উপর তোমার চোখ পইড়ছে মস্ত মিয়া। তোমার পছন্দের তারিফ করন লাগে। অমন মাইয়া এই দুই চাইর গেরামে নাই। আহা সারা গায়ে যেন যৈবন ঢল ঢল করতাহে।

কী মস্ত মিয়া চুপ কইরা রইলা যে? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারল ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত টাওয়াত কইরো।

করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে।

দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।

মস্তর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এলো।

উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে। মস্তর সঙ্গে আশ্বিয়ার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। আশ্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে। এই যে রাত বিরাতে আশ্বিয়ার সাথে মস্তর এত অন্তরঙ্গ মেলামেশা এ শুধু সামাজিক অন্যায় নয়, অধর্মও বটে। তাই নিয়ে মসজিদে বিচার বসাবে আশ্বিয়ার চাচা।

ফকিরের মা বললো, আমি কিন্তু একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।

সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক কইছ চাচি।

কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আশ্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।

নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।

উঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো মস্ত।

সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকালো ওর দিকে।

টুনি কিছু বললো না। একটু নড়লো না। চুপচাপ রইলো।

মস্ত ঘরে গিয়ে দরজা ঐটে দিলো।

কাল ভোরে আবার বেরগতে হবে ওকে।

অবশেষে মকবুল মারা গেলো।

ধলপহর হওয়ার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো সে।

সারা রাত কেউ ঘুমালো না।

গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মস্ত, টুনি সবাই জেগে রইলো মাথার পাশে।

সন্ধ্যাবেলা ফকিরের মা বলছিলেন লক্ষণ বড় ভালো না।

তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।

বহু লোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।

সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।



কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।

মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।

তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হল।

একটু পরে মারা গেলো সে।

ওর বুকের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো টুনি।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরির দীঘির পাড়ে মিলিয়ে গেলো।

বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইলো মস্ত।

পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হল তখন বুক ফাটা আত্ননাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগলো টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সাত্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করলো অনেকক্ষণ ধরে।

পরির দীঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হল বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট পুকুরে। আর সবার মনে। একটা লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়ে ছিলো। যার অস্তিত্ব ছিলো কি ছিলো না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদলো।

সারা বিকেল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করলো ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেলো না।

ফকিরের মা বললো কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।

তবু খেলো না টুনি।

মস্ত, সুরত আলী, আবুল, রশীদ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোর-গোড়ায় বসে।

আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আযানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেলো গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়ালো।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।

পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বললো, কই যাইবা না মস্ত মিয়া?

মস্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বললো, চলো।

বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো মস্ত।

টুনি ডাকলো, শোন।

মস্ত তাকিয়ে দেখলো এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ণ। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মস্ত বললো, কী।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?

মস্ত বললো, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো টুনি। তারপর আস্তে করে বললো, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।

বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।



মস্ত্র আস্তে করে বললো, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা?

টুনি মৃদু গলায় বললো, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো সে।

মস্ত্র বিব্রত বোধ করলো। কী বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বললো, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরায়া যামু। থাকন আর গেলো না। এ কথার আর উত্তর দিলো না মস্ত্র। গাঁয়ের সবাই জানে, সামনের শীতে আশ্বিনাকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বললো, বিয়ার সময় আমারে নাইওর আনবা না?

নিস্তেজ গলায় মস্ত্র পরক্ষণে বললো, আনমু।

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। এক টুকরো স্নান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বললো, কথা দিলা মনে থাকে যেন।

মস্ত্র বললো, থাকবো।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অলক্ষুইণা— অশুভ লক্ষণযুক্ত। **অবিরাম বর্ষণ**— একটানা বৃষ্টি। **অস্তিত্ব**— যা আছে এমন; সত্তা। **অশ্লীল মন্তব্য**— অশালীন বা খারাপ কথা। **আক্রোশ**— রাগ; ক্রোধ। **আর্তনাদ**— তীব্র চিৎকার। **এই জিন্দেগিতে**— এ জীবনে। **এঁটে দিল**— আটকে দিল। **কড়ি-কাঠ**— ঘরের চাল ধরে রাখার জন্য লোহা বা কাঠের আড়াআড়ি দেয়া কাঠ। **খানাপিনা**— খাবার দাবার। **ওনারে**— তাঁকে, এখানে মকবুলকে। **ক্ষেপে উঠল**— ভীষণ রেগে গেল। **ভীমরতি**— বয়সের কারণে বুদ্ধি লোপ বা কমে যাওয়া। **সম্পত্তি**— সম্পদ; টাকা-পয়সা; জমি ইত্যাদি। **নামাজের চৌকি**— নামাজ পড়বার জন্য ছোট আকারের চৌকি। **সরম-লজ্জা**— শাসাল— সতর্ক বা সাবধান করল। **নিমকহারাম**— যে উপকারী উপকার স্বীকার করে না বা ক্ষতি করে। **বাইরইয়া**— যা— বের হয়ে যায়। **মুর্ছা**— জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। **বেআকেইল্যা**— বুদ্ধিহীন। **ফিনকি**— খুব বেগে বের হয়ে আসা। **নরক-দোজখ**। **সচকিত**— ভয়ে চমকে বা কাঁপিয়ে দেয়া। **নির্বিকার**— বিকারহীন, ভাবলেশহীন। **ঠিকে নিবে**— ধার নেবে। **সরেস-শ্রেষ্ঠ**; **উৎকৃষ্ট**; **উত্তম**। **জমিন**— জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **শীঘ্রি**— তাড়াতাড়ি। **ইদানীং**— সম্ভ্রতি; বর্তমানে; আজকাল। **সেবা-শুশ্রূষা**— আদর যত্ন। **তদারক করে**— দেখাশুনা করে। **পাঁচরকম**— নানা রকম। **নির্লিপ্ত**— উদাসীন। **হক চকিয়ে**— হতভম্ব হয়ে। **সলজ্জ হাসি**— লজ্জা মাখানো হাসি। **ইলশে গুঁড়ি**— গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। **নিঝুম রাত**— গভীর রাত। **শ্লথ**— ধীর। **প্রলাপ**— বিলাপ; অর্থহীন কথাবার্তা। **উতলা**— অস্থির। **দাওয়ায়**— বারান্দায়। **ছলছল**— চোখে জলপূর্ণ হয়ে থাকা; কাঁদো কাঁদো অবস্থায় চোখের পাতা পানিতে ভিজে আসা।



সারসংক্ষেপ :

আশ্বিনার সঙ্গে মস্ত্রের বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে মকবুল পাত্র হিসেবে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে - এ-কথাটা বাড়িতে আর চাপা থাকলো না। কিন্তু বাধ সাধে আবুল, বাড়ির অন্য সবাই, বিশেষ করে ফাতেমা আর আমেনা। আশ্বিনার সঙ্গে আবুলের বিয়ে দিতে মকবুল রাজি হয় না। কারণ এর মধ্যেই সে তিন তিনটে বউকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এক পর্যায়ে ফাতেমা আর আমেনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মকবুল তাদেরকে তালুক দিয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ আবুল তার বসার পিঁড়িটা মকবুলের কপাল লক্ষ করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। পিঁড়ির আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে মকবুলের কপাল থেকে। এসব কিছুই মস্ত্র বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে সবার অলক্ষে বেরিয়ে যায় পরির দীঘির পাড়ে। পরদিন আমেনা আর ফাতেমার বাপের বাড়ির লোকজন এসে তাদেরকে নিয়ে যায়। বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করতে আশ্বিনা রাজি হয়নি। বাড়ির সকল কাজকর্ম সামাল দিয়ে টুনি যারপরনাই আন্তরিকতার সঙ্গে মকবুলের সেবাযত্ন করে। এদিকে মস্ত্র সকলকে উপেক্ষা করে মাঝি বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলো। আশ্বিনার সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর হতে থাকলো এই যাতায়াতের মধ্য দিয়ে। অসুস্থতায় ধুঁকে ধুঁকে মকবুল একরাতে মারা যায়। কয়েকদিন পর টুনি মস্ত্রকে কাছে পেয়ে তাকে সময় করে বাপের বাড়ি রেখে আসতে বলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন



৩৩. আবুল কতজন স্ত্রীকে কবরে পাঠিয়েছে?

ক. দুজন

খ. তিনজন

গ. চারজন

ঘ. একজন

৩৪. মকবুল বুড়োর কবর দেখে টুনির যে প্রতিক্রিয়া হয়—

ক. প্রতিহিংসা জেগেছিল

খ. আনন্দ হয়েছিল

গ. বুক কেঁপে উঠেছিল

ঘ. অনুশোচনা হয়েছিল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অপরাজিতা অগ্রসর হয়ে স্বামীর নিকট আসল। জীবনে যে স্বামীকে সে ভালোবাসা দেয়নি, অশন-বসন দেয়নি, কোনো খোঁজখবর করেনি, মরণকালে তাকে সে শুধু একটু দেখা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

৩৫. উদ্দীপকের অপরাজিতা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. টুনি

খ. সখিনা

গ. আশিয়া

ঘ. হালিমা

৩৬. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে—

i. অনুশোচনায়

ii. আত্মতৃপ্তিতে

iii. অনুভূতিহীনতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

পাঠ-১০



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- টুনি ও মস্তুর জীবনের পরিণতির কথা বলতে পারবেন;
- ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিলো টুনি।

সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলো সে।

পরিচর দীঘির পাড়ের উপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়লো। শুকনো মাটির সাদা চেলাগুলো চিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।

ভাটার স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিলো মস্ত।

সেই নৌকো।

যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলো সে। দুধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথই জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী-নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকো চালানোর প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা। মস্ত সহসা বললো, বাইরে আইসা বস না। গায়ে বাতাস লাইগবো।

টুনি পরক্ষণে বললো, আইতাছি। কিন্তু সহসা এলো না সে।



এলো অনেকক্ষণ পরে ।

বাইরে কাঠের পাটাতনের উপরে ছোট হয়ে বসলো টুনি ।

সেই নদী ।

পুরনো নদী ।

আগে যেমনটি ছিলো তেমনি আছে ।

আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করলো না টুনি ।

উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকালো না কোনো দিকে ।

শুধু বললো, আশ্বিনারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?

মস্ত সংক্ষেপে বললো, হু ।

টুনি বললো, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আশ্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা?

এ কথার কোনো জবাব দিলো না মস্ত । সে শুধু দেখলো, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আত্মহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে ।

উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বললো, চুপ কইরা রইলা যে?

মস্ত হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বললো, শান্তির হাট ।

টুনি চমকে তাকালো সেদিকে ।

ভাটার স্রোত ঠেলে নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে । সার বাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ।

সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগলো মস্ত । একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো নৌকো । পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো টুনি । মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিলো আবার ।

মস্ত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে । গভীরভাবে কী যেন দেখছে সে ।

নৌকোটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বললো, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি?

মস্ত চুপ করে রইলো ।

টুনি আবার বললো, হাটে কি কোনো কাম আছে?

মস্ত মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বললো, মনোয়ার হাজিরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকমু । চল যাই ।

টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল । মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলো ওর । মস্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে ।

মস্ত আবার বললো, মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো । আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর ।

টুনির চোখের কোণে তখনও দুফোটা জল চিকচিক করছে । অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়লো সে । আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বললো, না তা আর অয় না মিয়া । তা অয় না । বলতে গিয়া ডুকরে কেঁদে উঠলো সে । হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মস্ত । একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুলো না ওর ।

তারপর ।

তারপর নদীর স্রোতে বয়ে চললো । কখনো ধীরে কখনো জোরে । কখনো মিষ্টি মধুর হুন্দের ।

সেদিন হাটবার । সওদা করে বাড়ি ফিরছে মস্ত । দুই পয়সার পান ।

এক আনার তামাক । আর দশ পয়সার বাতাসা ।

কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু । ঘরে ঘরে ধান উঠছে । অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না । কাজ আর কাজ । সারাদিন ধান কেটে এনে পাহারা দিয়ে রাখে । রাতে গরু দিয়ে মাড়ায় । তারপর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে ।

হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মস্ত দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা । মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে । দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না । মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে ।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন ।



ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়লো মস্তুর।

বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।

কেউ নেই।

জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।

টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।

প্রথম প্রথম খোঁজ-খবর নিতো। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মস্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।

হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিলো। বছর

তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।

আবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মস্তুর। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়। যে-কোনো কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।

উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিলো আশিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করলো সে।

মস্তুরকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসালো ওকে। এক ছিলাম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেলো আশিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে।

উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। পরির দীঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।

কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।

আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরি।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে।

রাত বাড়ছে।

হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিরাম বর্ষণ— একটানা বৃষ্টি। ঠিকে নিবে— ধার নেবে। সরেস— শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; উত্তম। জমিন— জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে— পথের দূরত্ব কমে যায়। নাওডা— নৌকাটা। নাইয়র— বিবাহিত নারীর পিতৃগৃহে গমন করা। বোবা চাউনি— ভাবলেশহীন চোখে তাকানো।



সারসংক্ষেপ :

মকবুলের মৃত্যুর কয়েকদিন পর টুনি বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলো। মস্তুর টুনিকে নিয়ে ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিলো। সেই নৌকা, যাতে করে মস্তুর টুনিকে নিয়ে এসেছিলো তার বাপের বাড়ি থেকে। শান্তির হাট দেখে মস্তুর সেখানে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা করে। মস্তুর জানায়, সে নামবে ওখানে, হাজিকে বললে মোল্লা ডেকে তাদের বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। কথাটা বলবার সময় আবেগে মস্তুর গলাটা থরথর করে কাঁপে। কিন্তু টুনি সায় দেয় না মস্তুর এ-প্রস্তাবে। সে কেবল ফিসফিস করে বলে, ‘না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না।’ কথাটা বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে টুনি। টুনি আর মস্তুর জীবনে যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো, তা পরিণতি পায়নি। মস্তুর বিয়ে করেছে আশিয়াকে। তাদের একটি সন্তানও আছে। অনেক বছর হল টুনির সঙ্গে দেখা হয় না। বুড়ো মকবুল, আবুল, সুরত আলী সবাই পরপারে চলে গেছে। হীরনের বার দুয়েক বিয়ে হয়েছিলো, দুবারই তালাক হয়ে গেছে। এখন সে বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। মস্তুর চেষ্টা করছে তাকে আর একটি ভালো বিয়ে দেবার। কারণ এখন সে-ই বাড়ির কর্তা। সবাই মরে যায়; কিন্তু রেখে যায় উত্তরাধিকার। যেমন সুরত আলী তাঁর ছেলেকে রেখে গেছে আর দিয়ে গেছে পুঁথি পড়ার চমৎকার গুণ। মকবুল নেই; কিন্তু হীরন রয়েছে। একদিন হয়তো মস্তুরও থাকবে না; কিন্তু



তাদের উত্তরাধিকার থাকবে। এই দিন থাকবে না, অন্য দিন এসে যাবে; যেমন এই সকল মানুষ থাকবে না, অন্য মানুষেরা এসে পৃথিবীতে বসবাস করতে শুরু করবে। হাজার বছর ধরে পৃথিবী এভাবেই চলেছে –হয়তো চলবে আরো হাজার বছর।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. হাট থেকে মস্ত কী কী কিনে এনেছিল?

- i. এক আনার তামাক
- ii. দুই পয়সার পান
- iii. দশ পয়সার বাতাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

৩৮. মস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

- i. পুরাতনের বিদায়
- ii. নতুনের আগমন
- iii. পুরাতনের সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি চিরকালের নবীনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর কবিতার চরিত্রগুলো সেই চিরকালের প্রকৃতির সন্তান। এরা যায়, আসে –থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি চিরকালই নানা রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে বিরাজমান থাকে।

৩৯. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোন উপন্যাসের?

- ক. হাজার বছর ধরে
- খ. আরেক ফাল্গু
- গ. বরফ গলা নদী
- ঘ. কাঁদো নদী কাঁদো

৪০. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে নিচের যে বাক্যের মিল রয়েছে—

- ক. কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে।
- খ. মইরলে পরে সব মিয়ায়ে যাইতে হইবো কবরে।
- গ. মানুষ মাত্রই ভুল।
- ঘ. হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে সূর্য উদিত হয়।



অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।





চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৪১. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
 ক. ১৯৬৪ খ. ১৯৬৫ গ. ১৯৬৬ ঘ. ১৯৬৭
৪২. কাশেম শিকদার ও তার স্ত্রী কী নিয়ে বানের জলে ভেসেছিলেন?
 ক. খাদ্যদ্রব্য খ. টাকার কলসি গ. কাঁথা ও বালিশ ঘ. শূন্য হাতে
৪৩. ‘সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না’- হাসিটি কার?
 ক. আশ্বিয়ার খ. টুনির গ. সালেহার ঘ. সখিনার
৪৪. হীরনের বিয়েতে কত টাকা মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল?
 ক. সোয়া আট টাকা খ. সাড়ে আট টাকা গ. সোয়া এগার টাকা ঘ. সাড়ে এগার টাকা
৪৫. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে কোন কোন বিবির নাম রয়েছে?
 ক. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, অহল্যাবিবি খ. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, চণ্ডীবিবি
 গ. বসন্তবিবি, কলেরাবিবি, মনসাবিবি ঘ. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, যক্ষ্মাবিবি
৪৬. ‘আশ্বিয়াকে বিয়া করলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?’- উক্তিটি কার?
 ক. টুনির খ. সালেহার গ. আমেনার ঘ. সখিনার
৪৭. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি যে শ্রেণির-
 ক. কাব্যধর্মী খ. সামাজিক গ. ডিটেক্টিভ ঘ. রূপকধর্মী
৪৮. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে যে সমাজ চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা মূলত-
 ক. উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের খ. নিম্নবিত্ত শ্রেণির গ. ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ঘ. একান্নবর্তী পরিবারের
৪৯. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে যে চরিত্রটি প্রতিবাদী-
 ক. আশ্বিয়া খ. সখিনা গ. টুনি ঘ. সালেহা
৫০. সালেহা যে প্রকৃতির মেয়ে-
 ক. বদরাগী খ. সহর্মী গ. আন্তরিক ঘ. কূটিল
৫১. ‘ঘরের বৌ করে আনার মত মেয়ে ও নয়’- কেন আশ্বিয়া সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে?
 ক. বয়স বেশি খ. পরিবার হাঁপানি রোগী গ. বদমেজাজি ঘ. ভৃত্তান্ত নারী
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
- স্ত্রীদের ধমকে উঠে কলিম শেখ, ‘তোদের কি গায়ে শক্তি নেই? আরো জোরে টেকিতে পাড় দে না, হাঁ।’ এমনভাবে গর্জে ওঠে কলিম শেখ যেন মাঠে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে।
৫২. উদ্দীপকের কলিম শেখ ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
 ক. বুড়ো মকবুল খ. সুরত আলী গ. কদম শেখ ঘ. গনু মোল্লা
৫৩. কলিম শেখ ও চরিত্রটির মিল রয়েছে যে বিষয়ে-
 ক. মমত্ববোধে খ. নিমর্মতায় গ. সহযোগিতায় ঘ. সৌজন্যবোধে
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
- গ্রামের লোকের বিশ্বাস কলেরা রোগের মূল ওলাবিবি। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ওলাবিবির এক পা খোঁড়া এবং অদৃশ্য। বসন্তবিবি এবং যক্ষ্মাবিবি নামে ওলাবিবির আরও দুই বোন রয়েছে। ওলাবিবি যে গ্রামে প্রবেশ করে সে গ্রামেই কলেরা রোগ দেখা দেয়।
৫৪. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?
 i. লোককথা বর্ণনায় ii. ঐতিহ্যপ্রীতিতে iii. মানসিকতায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii
৫৫. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে-



- i. সামাজিক সচেতনায় ii. কুসংস্কারে বিশ্বাসে iii. লিঙ্গবৈষম্যে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, ‘কোথা থেকে তুমি এলে?’

৫৬. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে জহির রায়হানের কোন উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আরেক ফাল্লুন খ. হাজার বছর ধরে গ. শেষ বিকেলের মেয়ে ঘ. বরফ গলা নদী

৫৭. উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে—

i. আবহমানকালের বাংলা ii. বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চল iii. বাঙালির প্রাচীন জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. ‘তা আর অয় না মিয়া ! তা অয় না !’ উক্তিটির মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে—

ক. বুড়ো মকবুলের বিয়ে খ. টুনির বেড়াতে যাওয়া গ. মস্ত ও টুনির বিয়ে ঘ. আশিয়া ও মস্তুর বিয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জীবনকে সুন্দর করতে হলে সৌন্দর্যের নিদর্শন শিল্পকে সাধারণ জীবনে একটু স্থান দেয়া দরকার। আমাদের বাড়ি সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির প্রাঙ্গণ সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির আসবাবপত্র সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম সুন্দর হওয়া চাই, বাড়ির বেষ্টনিও সুন্দর হওয়া চাই। তারপর আমরা যা পারি, আমরা যা ব্যবহার করি, সবই সুন্দর হওয়া চাই। সৌন্দর্য আমাদের জীবনের অপরিহার্য একটি অঙ্গ। জীবনের এই সৌন্দর্যকে সাহিত্যশিল্প অঙ্গীভূত করে। আর নিজের সৃষ্টিকর্মে এই সৌন্দর্যকে রূপায়ণ করতে পারাটাই হচ্ছে একজন সাহিত্যশিল্পীর সাফল্য।

ক. ‘লালসালু’ কোন ধরনের উপন্যাস?

খ. আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?—আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকের সৌন্দর্য ভাবনা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।”—স্বীকার করেন কী? মন্তব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিগুলো তুলে ধরুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

টেকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বার বার জমিলার কথা মনে পড়ছে বুড়ো গণি মোল্লার। জমিলা কেমন যেন ধপাস ধপাস করে ধান ভানে। টেকিতে চড়লেই ওর গান গাওয়ার সখ চাপে। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। চেহারা য় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি মর্মভেদী। টেকিতে চড়লে, টেকিকে আর সুখ দেয় না ও। মনে হয় টেকির সাথে আজ ওর একটা এম্পার কি ওম্পার হয়ে যাবে।

ক. আওরঙ্গজেব কে ছিলেন?

খ. মকবুলের পরিবার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসকে কীভাবে প্রতিফলিত করে?—আলোচনা করুন।

ঘ. “ধান ভানার উৎসব আবহমান বাংলায় লালিত একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি।”—উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

কেমন বিচিগুলি তেল চুকচুক কচ্ছে— আজই গাছ থেকে পড়েছে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গোরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙি গাইটা একেবারে রাক্ষস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে



অনেকগুলো হলো। অতঃপর দুর্গা খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বিচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রক্ষ্মা চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহাখুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

ক. মস্ত তাবিজটা কোথায় বেঁধেছিল?

খ. ‘নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি।’ – বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? – বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. “প্রেম্ভাপট ভিন্ন হলেও দুর্গা যেন টুনিরই প্রতিচ্ছবি।” –উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, ‘ওর সমস্ত ন্যাকামি।’ অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, ‘বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।’ শাশুড়ি বলিলেন, ‘কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছিল।’ কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

ক. মস্তুর কতটুকু জমি আছে?

খ. ‘তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌছায়া দিবা?— কে, কাকে, কেন বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের নিরু ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. নিরু ও হালিমা উভয়ের করুণ পরিণতির জন্য আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দায়ী।” –উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, ‘ওর সমস্ত ন্যাকামি।’ অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, ‘বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।’ শাশুড়ি বলিলেন, ‘কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছিল।’ কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

ক. মস্তুর কতটুকু জমি আছে?

খ. ‘তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌছায়া দিবা? –কে, কাকে, কেন বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের নিরু ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “নারীর করুণ পরিণতির জন্য আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনেকটাই দায়ী।” –স্বীকার করেন কী? উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, “রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই কথাগুলো যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়াদ্রু হৃদয় হইতে উথিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে।

ক. ‘বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও।’ –কে, কাকে বলেছিল?

খ. মনোয়ার হাজির পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি কী সাদৃশ্যপূর্ণ? – মতামত ব্যক্ত করুন।

ঘ. “প্রেম্ভাপট ভিন্ন হলেও রতন ও টুনির হৃদয়ের অন্তঃস্করণ একই ধারায় প্রবাহিত।” –উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আল্লাদে ঘোমটা খুলিয়া মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাভারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। রূপের ভারে সকলে ভঙ্গিয়া



পড়িতেছে। যুথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

ক. টুনি কাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল?

খ. শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসা তোরাবের অদ্ভুত আচরণের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

হায়রে সংসার। কী বিচিত্র এর লীলা! পূর্ণার সঙ্গে অপূর্বর বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এলে বিশাখা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সে তার স্বামী মোবারককে পূর্ণার সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রলুব্ধ করে তোলে। বিশাখার এমন প্রস্তাবে মোবারক যারপরনাই খুশি হল। মোবারকের নিকট তখন বিশাখাকে অনেক বড় বলে মনে হয়।

ক. মস্তুর মায়ের কবর কোথায়?

খ. নস্ত্র শেখের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের বিপাশা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক এবং ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে নারী জীবনের ঈর্ষাপরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।” –যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

ইতিহাসের জগৎ থেকে কোন ঘটনা কিংবা চরিত্র অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করলে তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের চরিত্র কিংবা ঘটনাকে বিকৃত না করে শিল্পসুখমার মাধ্যমে কাহিনি ও চরিত্র বয়ন করতে পারাটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা। এ ধরনের উপন্যাসে লেখকের কল্পনার রঙ অবশ্য থাকে। কারণ ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন, ইতিহাস নয়। ইতিহাসের মাল-মসলা, উপকরণ ও তথ্য নিয়ে তিনি কল্পালের উপর রক্ত-মাংস দিয়ে একে আরও সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজসিংহ’ ও ‘চন্দ্রশেখর’ এ ধারার দুটো শ্রেষ্ঠ রচনা।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কয়টি?

খ. বাংলাদেশের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাব প্রকাশিত হয়নি, একটি অংশ ফুটে উঠেছে মাত্র।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল, বলিতে লজ্জা নাই, তাহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইল যে, তাহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাহাকে টলাইতে পারি না।

ক. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কোনটি?

খ. ‘আদিম মাদকতায় মাতাল ছিল মকবুল।’ –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে কার প্রতিনিধিত্ব করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “প্রথা বহির্ভূত বিয়ের কারণেই মূলত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।” –উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১১

কাল ভর দুপুরে বারুণী দীঘির পাড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। শুকনো ডালপাতা কুড়োতে। বিকেল হলেও মেয়েটা আর ঘরে ফেরে না। মেয়ের মা-তো ভয়ে অস্থির। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোন বিপদে পড়ল। প্রথমে ওকে দেখে ডহর বাড়ির



থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তালগাছের শিয়রে উঠে দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়িতো অবাক, 'বলি শেফালি! তুই কি লজ্জা-শরমের মাথা খাইছিস? দিন দুপুরে গাছে উইঠা গীত গাইবার লাগছস?' শেফালি ভয় পাওয়ার বদলে উল্টো বুড়ির ঘাড় মটকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

ক. 'ওইহানে চুড়ি পাওন যায়?' -উক্তিটি কার?

খ. ওলা বিবি কে? তার পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? -আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও উপন্যাসের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যেন একই সূত্রে গাঁথা।" -মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১২

ভাটি অঞ্চলের একটি গ্রাম। বসন্তের আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে, দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস যখন অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়, তখন গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে ঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। গ্রামটিতে তখন ধুম পড়ে পুঁথিপাঠের। পাঠ করা হয় মহায়া, মলুয়া কখনোবা গাজীকালু, সোনাভানের পুঁথি।

ক. ধানের মণ্ডসুম শেষ হলে মস্ত্র কোথায় কাজ করে?

খ. সংক্ষেপে আবুলের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. "পুঁথি পড়া আমাদের হাজার বছরের লোকসংস্কৃতির অংশ।" -উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯ এর নমুনা উত্তর :

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান পাঁচটি।

খ. 'বাংলাদেশের উপন্যাস' বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত একটি শাখা।

বাংলাদেশের উপন্যাস ঐতিহ্যবাহী বাংলা উপন্যাসের কনিষ্ঠতম ধারা। এদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে মূলত এখানকার ভৌগোলিক আবহ, কৃষিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধ এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। নিম্নে বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল- এ দেশের উপন্যাসে একদিকে রয়েছে কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবন, অপরদিকে দেখা যায় আধুনিক রুচির পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনধারা। এর একদিকে আছে বাংলার প্রকৃতির ঐশ্বর্যময় উপস্থাপনা, অপর দিকে রয়েছে আধুনিক মানুষের অন্তরের জটিল বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের উপন্যাসে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, তেমনি অপর দিকে রয়েছে রোমান্টিক কল্পনা বিলাস। এদেশের উপন্যাসে একদিকে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্তিত্ব, অপরদিকে ছায়াপাত করেছে হৃদয়ের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোচনা অংশে উল্লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নির্দেশ করে।

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি যখন কোনো বাস্তব কাহিনিকে অবলম্বন করে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপলাভ করে তখন তাকে উপন্যাস বলা হয়। উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবনচিত্র তুলে ধরে। উপন্যাস যখন কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা ঘটনাকে অবলম্বন করে তখন তা ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের জগৎ থেকে কাহিনি বা চরিত্র সংগ্রহ করে। এখানে উপন্যাস রচয়িতা ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করেন না। তবে তিনি কখনো কখনো ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে থাকেন। উপন্যাসের আলোচনা অংশেও দেখা যায়, যে উপন্যাসিক এ ধরনের উপন্যাস রচনা করেন তিনি ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করে থাকেন। তাঁর রচনায় ইতিহাসের প্রচলিত সত্য একটি নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্য রচনার ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।



ঘ. উদ্দীপকে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাস শিল্প হতে মাত্র একটি ধারা অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

উপন্যাসে বাণীরূপ পায় জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। এতে প্রতিফলিত হয় দেশ,কাল ও সমাজের বাস্তব চিত্র। উপন্যাস পাঠক উপন্যাস থেকে রসমাধুর্য উপভোগ করেন। উপন্যাসের রসমাধুর্যের সঙ্গে তার নিকট জীবন ও চারপাশের পরিচিত জগৎ নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে থাকেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের মালমসলা ও তথ্য-উপকরণ থাকে। আর ঔপন্যাসিক একে আরও প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলে। পক্ষান্তরে পাঠ্য রচনায় উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এখানে উপন্যাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গঠনশৈলী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে উপন্যাসের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়েরও বিশ্লেষণ রয়েছে।

উপন্যাসে শুধু একটি অংশের আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাস-শিল্পের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পাঠ্য-অংশে উপন্যাসের ধারাগুলোর নিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র, ভাষা ও সংলাপ, লেখকের জীবনদর্শন প্রভৃতির আলোচনাও উঠে এসেছে। সর্বোপরি রয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি, একটিমাত্র অংশ ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০ এর নমুনা উত্তর :

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস।

খ. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে বুড়ো মকবুল সিকদার বাড়ির প্রধান পুরুষ।

আবহমান বাংলায় মকবুল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। সে সমাজপতি হলেও তার মধ্যে সমাজ প্রধানের স্বভাব ধর্ম ছিল না। তার ঘরে তিনজন স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রীদেরকে সে নির্মম শাসনে রাখে। কিন্তু সে স্ত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে মোটেও খেয়াল রাখে না। ঘরে-বাইরে সে স্ত্রীদেরকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করায়। সম্পদের লোভে মকবুল আশিয়াকে চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে ঘরে আনতে চেয়েছে। এর জন্য তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালুক পর্যন্ত দিতে হয়েছে। মানব জীবনে অন্ধকার পর্যায়ের যে দিকগুলো রয়েছে তার সবকয়টিই বুড়ো মকবুলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই মকবুলকে আদিম মাদকতায় মাতাল বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের বুড়ো মকবুলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি সুসমাময়। কিন্তু মানুষের জীবন এর আলোকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর নয়। গ্রামীণ জীবনে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিচু দৃষ্টিভঙ্গির বেড়া জালে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে কোনো রকমে। জীবনের মহত্ত্ব তাদেরকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় না। প্রাচীন সমাজের যে যুথবদ্ধতা, নিষ্ঠুর পুরুষতান্ত্রিকতা ও অমানবিক নারী নির্যাতন তার সবই রয়েছে বুড়ো মকবুলদের গ্রামীণ সমাজে।

উদ্দীপকে দেখা যায় চরিত্রটি বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছে। কিন্তু তার স্ত্রী তার নিকট থেকে পলায়ন করে। উদ্দীপকের চরিত্রটি তাকে খুঁজে পেয়েছেন নদীতে রাখা একটি বজরায়। স্ত্রীকে তিনি সঙ্গে নিতে চান কিন্তু তার স্ত্রী সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক। উপন্যাসেও দেখা যায় বুড়ো মকবুল বৃদ্ধ বয়সে টুনিকে বিয়ে করে। অসম বয়সের কারণে টুনির সঙ্গে মকবুলের কোন প্রকার বোঝাপড়া গড়ে উঠেনি। টুনি ঘুরে বেড়ায় মকবুলের চাচাত ভাই মস্তুর সঙ্গে। স্বামী কিংবা সংসারের প্রতি তার কোন ক্রক্ষেপ নেই। স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও মকবুল তার কোন সান্নিধ্য পায় না। তাই বলা যায় উদ্দীপকের বৃদ্ধের সঙ্গে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুড়ো মকবুলের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের চরিত্র ও বুড়ো মকবুল সামাজিক প্রথার বাইরে গিয়ে বিয়ে করায় তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছে।

বিয়ে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষ সংসার রচনা করে এই বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে। সংসার জীবনে মানুষ আনন্দ, প্রশান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। আর এর মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চমৎকার



বোঝাপড়া। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধানের কারণে অনেক সময় এই বোঝাপড়াটা গড়ে উঠে না। তার অনিবার্য পরিণতি হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে দেখা যায় বুড়ো মকবুল কিশোরী টুনিকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে। কিন্তু তখনো টুনির বিয়ের বয়স হয়নি। মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সে খেলার ছলে ঘুরে বেড়ায় মকবুলের চাচাত ভাই মস্তুর সঙ্গে। কোন কোন সময় হতাশায় টুনি বুড়ো মকবুলের মৃত্যু কামনা করে। টুনি স্বপ্ন দেখে মকবুল মারা গেলে সে পাখির মতো উড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মস্তুর কাছে পাবার জন্য টুনি একসময় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। যদিও এই কৌশলটি সফল হয়নি। তবুও এর পরিণতি হয় মারাত্মক। বুড়ো মকবুল মারা যায়। উদ্দীপকের চরিত্রটিও বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করে। একসময় তার স্ত্রী তার নিকট থেকে পলায়ন করে। স্ত্রীকে তিনি সৌভাগ্যক্রমে খুঁজে পান একটি বজরা নৌকায়। কিন্তু স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ফিরে যেতে রাজি নয়। অতি সাধ্য-সাধনা করেও উদ্দীপকের চরিত্রটি স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি।

উদ্দীপকের বৃদ্ধ লোক এবং উপন্যাসের বুড়ো মকবুল দুজনেই সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে অধিক বয়সে বিয়ে করেছেন। তারা তাদের স্ত্রীদের বয়স বিবেচনা না করে অল্পবয়সী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করেছেন। ফলে উভয়ের জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। তাই বলা যায়, উপন্যাসে বুড়ো মকবুলের প্রেক্ষাপটটি কিছুটা ভিন্ন হলেও সামাজিক প্রথার বাইরে বিয়ে করায় উভয়ের জীবনেই সংকট তৈরি হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১১ এর নমুনা উত্তর :

ক. উক্তিটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র টুনির।

খ. ওলা বিবি বলতে কলেরা বা ভেদবমি রোগকে বোঝানো হয়েছে।

কলেরা একটি সংক্রামক ব্যাধি। একসময় গ্রামবাংলায় কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিত এবং গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ওলাবিবি একজন নারী। তার একটি খোঁড়া পা আছে। হযরত আলি ওলাবিবিকে আছাড় মেরে তার এক পা খোঁড়া করে দেন। ওলা বিবির অন্য দুই বোন হচ্ছে বসন্ত বিবি ও যক্ষ্মা বিবি। কোনো বাড়িতে ওলা বিবির আগমন ঘটলে সে বাড়িতে কলেরা রোগ দেখা দেয়।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ভুতের বিশ্বাসে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবহমান বাংলায় গ্রামীণ জীবনে যে সকল সংস্কার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভুতে বিশ্বাস। কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করলে কিংবা অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে ধরে নেয়া হয় যে তাকে ভুতে ধরেছে। এই ভুতকে তাড়ানোর জন্য তখন কবিরাজ বা কোন ওঝার নিকট নেয়া হয়। উদ্দীপক এবং ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে এরকম ভুতে বিশ্বাসের বর্ণনা রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় শেফালি বারুণী দীঘির পাড়ে ডালপাতা কুড়াতে যায়। বিকাল হয়ে গেলেও সে বাড়ি ফেরার নাম করে না। তাকে হঠাৎ সেখানে তালগাছের মাথায় আবিষ্কার করে ডহর বাড়ির বুড়ি। শেফালি তালগাছের মাথায় বসে দুদিকে দু’পা ছড়িয়ে দিয়ে গান গায়। কেউ কাছে গেলে তার ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসেও দেখা যায়, মজু ব্যাপারির মেয়ে সখিনা একদিন খুব ভোরে শুকনো ডালপাতা কুড়াতে পরির দীঘির পাড়ে যায়। সেখানে সে লম্বা তেঁতুলগাছের মগডালে বসে উচ্চস্বরে গান গাইতে থাকে। তখন তার চাচা তকু ব্যাপারি তাকে গাছ থেকে নামাতে গেলে সে উল্টো চাচাকে শাসায়। এমনকি চাচাকে জানে খতম করে ফেলার হুমকি দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. ‘উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যেন একই সূত্রে গাঁথা।’ –মন্তব্যটি যথার্থ।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে অনেক অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ভুত-প্রেতে বিশ্বাস। আসলে পৃথিবীতে ভুতের কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রামীণ সমাজে যেটিকে ভুত বলে বিশ্বাস করা হয় তা আসলে একটি মানসিক রোগ। ভুতে ধরার বিষয়টি মূলত মানুষের মস্তিষ্কে অস্বিজেনের অভাবজনিত একটি ঘটনা। মস্তিষ্কে অস্বিজেনের অভাব ঘটলে একধরনের হ্যালুসিনেশন তৈরি হয়। এটি মানুষকে অসংলগ্ন আচরণ করতে বাধ্য করে। তাই বাস্তব পৃথিবীতে ভুতকে দেখা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শেফালি বারুণীর দীঘির পাড়ে পাতা কুড়াতে গেলে তাকে ভুতে ধরে। সে বিশাল লম্বা একটি তালগাছে চড়ে বসে। গাছের উপর বসে গান গায়। ডহর বাড়ির বুড়ি তার নিকট গেলে সে তার ঘাড় মটকিয়ে দেবার



হুমকি দেয়। পক্ষান্তরে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসেও রয়েছে মজু ব্যাপারির মেয়ে সখিনা পরির দীঘির পাড়ে ভোরে শুকনা পাতা কুড়াতে গিয়ে বিকাল হলেও আর ঘরে ফেরে না। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তেঁতুল গাছের মাথায়। সেখানে সে দু’পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মনের আনন্দে গান গায়।

উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাস দুটিতেই সমাজের প্রচলিত লোকবিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শিক্ষার অভাব থাকলে এ ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়। এছাড়া সেখানে বিজ্ঞান চিন্তার অনুপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেনি। প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারকে তারা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে উল্লিখিত ভূতের কুসংস্কার যেন একইসূত্রে গাঁথা।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১২ এর নমুনা উত্তর :

ক. ধানের মওসুম শেষ হয়ে গেলে মস্ত কলাই, মুগ, তিল, সরিষার খেতে কাজ করে। মাঝে মাঝে সে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার কাজ নেয়।

খ. ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে আবুল একটি অমানবিক চরিত্র।

আবুল হচ্ছে শিকদার বাড়ির কর্তা মকবুলের প্রতিবেশি। সে তিনটি বিয়ে করেছে। তার বর্তমান স্ত্রীর নাম হালিমা। এর আগে সে তার দুটো স্ত্রীকে পিটিয়ে মেরেছে। তাদের নাম ছিল আয়েশা ও জমিলা। কারণে-অকারণে আবুল বউদেরকে পিটায়। বউ মারায় সে যেন পৈশাচিক আনন্দ পায়। আবুল প্রকৃতপক্ষে আমাদের গ্রামীণ সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিনিধি। এই পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে সম্মান দেয় না, ভালবাসে না, এমনকি মানবিক অধিকারটুকু পর্যন্ত দিতে চায় না। আবুল সমাজে নির্মমতার প্রতীক।

গ. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে পুঁথি পড়ার সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন প্রায় স্থবির, গতিহীন। এখানে মানুষের জীবনে তেমন কোন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় না, জীবন চলে প্রায় পরিবর্তনহীনতায়। এখানে সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দের উপকরণ বলতেও তেমন কিছু নেই। তাই কর্মক্লান্ত মানুষ বেলা শেষে আনন্দের উপকরণ হিসাবে পুঁথিপাঠের আয়োজন করে। আর অবসর সময়ে গ্রামের সবাই গোল হয়ে বসে পুঁথিপাঠ শোনে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভাটি অঞ্চলের গ্রামটিতে পুঁথিপাঠের আসর বসেছে। গ্রামটিতে যখন মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস বয় তখন সেখানে পুঁথি পড়ার আসর জমে উঠে। সন্ধ্যার পর গ্রামের কর্মক্লান্ত মানুষ আনন্দ উপভোগের জন্য পুঁথিপাঠ শোনে। উচ্ছ্বসিত হয় গাজী কালু-চম্পাবতী কিংবা সোনাভানের কাহিনি শুনে। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসেও দেখা যায় সুরত আলী পুঁথি পড়ে। এখানেও সারা দিনের কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনে আনন্দের উপকরণ তেমন একটা নেই। তারা সন্ধ্যার পর আকাশ ভাসিয়ে যখন জোছনার বান ডাকে তখন ওঠোনে গোল হয়ে বসে, পুঁথিপাঠ শোনে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের পুঁথিপাঠের সংস্কৃতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. পুঁথি পড়া আমাদের আবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ।

গ্রামের মানুষ পুঁথি পাঠের মধ্য দিয়ে আনন্দের জগতকে খোঁজে। কেননা পুঁথির জগৎ রোমান্সের জগৎ। এই জগতের সঙ্গে মানুষ তার কল্পনার জগতকে মিলিয়ে নেয়। একসময় দেখা যায় তার সকল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কল্পলোকের পুঁথির জগতের সত্য। উদ্দীপকে দেখা যায় ভাটি অঞ্চলের গ্রামটিতে অবসর সময়ে পুঁথি পড়ার আসর বসে। সারা দিন পরিশ্রমের পর সুযোগ পেলেই গ্রামের মানুষ নাচ, গান, হাসি, তামাশা আর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। দখিনা সমীরণ তাদের স্বাগত জানায়। নিশ্চিতি রাতের ঘরের দীর্ঘ ছায়া তাদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। উপন্যাসেও রয়েছে আকাশে জোছনার বান ডাকলে শিকদার বাড়িতে পুঁথিপাঠের আসর জমে ওঠে। শিকদার পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠে আনন্দে। পুঁথির জগত তাদের নিয়ে যায় রোমান্সের জগতে। হয়তো এখানে তারা নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখে।

পুঁথিপাঠ আমাদের গ্রামীণ জীবনে আনন্দ লাভের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। নিস্তরঙ্গ জীবনে এই পুঁথিপাঠই সামান্য গতির সঞ্চারণ করে। পুঁথির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনের কল্পলোকে প্রবেশ করে। আর এভাবেই তার জীবনে জড়িয়ে থাকে পুঁথির জগতের সত্য। তাই বলা যায়, পুঁথিপাঠ আমাদের সমাজে হাজার বছর ধরে চলমান লোকসংস্কৃতির অংশ।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

- ক. ‘নিমক হারাম’ শব্দের অর্থ কী?
খ. ‘কথাটা চাপা থাকল না।’ –কোন কথাটি? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সাকিনা বিবি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ঘ. “উদ্দীপকের হরিদাসী ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের টুনির জীবনে বিপর্যয় নেমে এলেও উভয়ের পটভূমি ভিন্ন।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়। এক সময় সকলে মরে যায় কিন্তু রেখে যায় তার উত্তরাধিকার। মানুষের গড়া অনেক সভ্যতা চিরকালের তরে বিলীন হয়ে গেছে। এককালের পৃথিবীখ্যাত এশিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আজ আর ধ্বংসস্তুপ ছাড়া কিছুই নয়। কেবল প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় হয়ে পৃথিবীতে প্রবহমান রয়েছে। এভাবে পৃথিবী চলছে হাজার বছর ধরে। হয়তোবা চলতে থাকবে আরও হাজার বছর।

- ক. হীরন আজকাল কোথায় থাকে?
খ. সুরত আলীর ছেলেটা কীভাবে পিতার পুঁথিপাঠের গুণটি রপ্ত করেছে?
গ. উদ্দীপকের ভাবনা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাবই অনুরণিত হয়েছে ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

হঠাৎ চিৎকার করে উঠে মজিদ। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড করে বসে সে। ঘরের মাঝখানে এতগুলো লোকের সামনে সে হঠাৎ রহিমা আর জমিলাকে একসঙ্গে তালুক দিয়ে বসে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, তোরা আমার পীরের মাজারকে অপমান করছ। বাইর হইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা। পরিবেশ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে। পরক্ষণে একটা আত্নানাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রহিমা। জমিলা মুর্ছা যায়। আহাদের মা চিৎকার করে উঠে, ‘আহারে পোড়া কপাইল্যা, ই কি কইরলি তুই? ওরে পোড়া কপাইল্যারে, এই কি কইরলি?’

- ক. সার্কাস কী?
খ. ‘ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।’ –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে নারী জীবনের অসহায়ত্বই প্রকাশিত হয়েছে।” –মূল্যায়ন করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.ক	২.খ	৩.ক	৪.ক	৫.গ	৬.খ	৭.ঘ	৮.খ	৯.খ	১০.ক
১১.খ	১২.গ	১৩.খ	১৪.গ	১৫.খ	১৬.ঘ	১৭.ক	১৮.খ	১৯.খ	২০.ক
২১.ঘ	২২.ক	২৩.ক	২৪.	২৫.গ	২৬.গ	২৭.খ	২৮.গ	২৯.ক	৩০.খ
৩১.খ	৩২.ঘ	৩৩.খ	৩৪.ঘ	৩৫.ক	৩৬.ক	৩৭.ঘ	৩৮.গ	৩৯.ক	৪০.ঘ
৪১.ক	৪২.খ	৪৩.ঘ	৪৪.গ	৪৫.ঘ	৪৬.ক	৪৭.খ	৪৮.খ	৪৯.ক	৫০.ঘ
৫১.খ	৫২.ক	৫৩.খ	৫৪.ক	৫৫.খ	৫৬.খ	৫৭.ক	৫৮.গ		